প্রাচীন সভ্যতা

ডঃ ধর্মনারায়ণ দাস

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI vide Notification No. T. B. No. VI/H/79/53 dated 5. 12. 79

প্রাচীন সভ্যতা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

ধর্মনারায়ণ দাস, এম. এ. (ট্রিপল), পি-এইচ্. ডি.
প্রধান শিক্ষক, পানিহাটি ত্রাণনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, ২৪ পরগণা

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বই লিখলে তার ভূমিকাও লিখতে হয়। এটাই নাকি রেওয়াজ। ভূমিকায় লেখক দু'একটা সুযোগ নিয়ে থাকেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, লেখকের কোনো বিশেষ বক্তব্য থাকলে সে বক্তব্যের পেছনে তাঁর যুক্তিগুলোকে সহৃদয় পাঠকের কাছে উপস্থিত করা— এ সবের জন্যেই ভূমিকা। তবে ভূমিকা দীর্ঘায়ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস রচয়িতাদের। এতদিন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হোত বাংলার ইতিহাস। এর বদলে এখন পড়তে হবে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। এ রকম উদার এবং বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকেই ইতিহাসের পাঠ আরম্ভ হওয়া উচিত। তবে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে যে, এই পৃষ্ঠাসংখ্যার মধ্যে বিষয়বস্তুর প্রতি সুবিচার করা সুকঠিন, প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে।

গ্রন্থকার

SYLLABUS IN HISTORY

HISTORY OF ANCIENT CIVILISATIONS :	Pages :	No. of Lessons
A. (i) Why we should read history ; (to be acquainted with human civilisation, its development)	1	1
(ii) How we come to know of ancient people ?	2	1
B. EARLY MAN : Use of fire as early as 300,000 B. C. (by 'Peking Man') : Food gathering man.		1
OLD STONE AGE : Nature of tools and implements, their uses.		1
NEW STONE AGE : (By 8000 B. C.) Evolution of tools and implements. Man—a food producer.		2
The Neo-lithic revolution consisted also of domestication of animals : invention of pottery (wheel) : weaving (clothings) ; dwelling —stone houses with defences ; early transport ; beginnings of community life in settlements ; beliefs and arts (as evident from cave-paintings etc.) ; use of formal language as a means of communication ; worship of the Goddess of productivity.	6	4 (for 'B' as a whole)
C. COPPER-BRONZE AGE : Emergence of towns ; changes in production—specialisation (various types of skill of artisans and craftsmen) ; commerce (exchange of commodities) ; some changes in social life—classes ; inter-tribal conflicts ; emergence of an early form of state. Reasons of the growth of River-Valley Civilisations.	4	3

	Pages :	No. of Lessons
D. THE ERALY CIVILISATIONS (3000 B. C.—1500 B. C.)		
Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China —in outlines :		
(i) MESOPOTAMIA :		
(a) Location and antiquity ; earlier development of civilisation than in other areas.		
(b) Fertility of the soil—crops		
(c) Defence against floods.		
(d) Other occupations.		
(e) Achievements of Sumerians : imposing towers, mud-brick temples, fresco stone-cutting, metallurgy, transport and trade, script.	5	4
(ii) EGYPT :		
(a) Location and nature of the land :		
(b) The Pharaoh, the priest, script and scribes, tax collectors and 'soldiers' (workers) :		
(c) Trade ;		
(d) The Pyramids (examples) ;		
(e) Religious belifs ;		
(f) Chief occupations.	7	6
(iii) THE INDUS VALLEY :		
(a) The discoveries (brief reference to locations and findings) ;		
(b) Town planning ;		
(c) Food and other articles of use :		
(d) Crafts ;		
(e) Trade ;		
(f) Worship ;		
(g) Light thrown by relics upon classification in society.	7	5
(iv) CHINA		
(a) Valley of Huang Ho and Yangste-Kiang ;		

	Pages :	No. of Lesson
(b) China in early times ;		
(c) Myths (particularly of flood) ;	2	1
(v) Common features, in brief, of the riparian civilisations, with special reference to social and economic life.	3	2
E. THE IRON AGE-SOCIETIES :		
(a) Discovery and use of iron, its impact ;		
(b) Main features of social and economic life ;		
(c) Growth of Kingship.	2	2
I. (i) BABYLON :		
Farming and Commerce ; Temples and Priests ; Learning and culture ; The Code of Hamurabi—nature of socitey as revealed by the Code.		3
(ii) EGYPT AS AN IMPERIAL POWER :		
Colonies : The power of priests		2
(iii) IRAN :		
Rise of Persia ; Zoroaster.		2
(iv) THE JEWS :		
Hebrews in Egypt. Hebrew exodus under Moss ; flight from slavery	12	2 (for 'I' as a whole)
II. GREECE (only in broad outlines) :		
An introductory note on the influence of Crete : The Homeric Age. The city state, cultural interchange, colonisation. Athens and Sparta : their social and political life. Athens vs. Sparta. Cultural greatness of Athens ; Literature, Arts, Religion—brief reference to a few eminent persons e.g. Pericles Sophocles, Socrates, Herodotus. Macedon : Alexander—his invasion of India. Fall of the Empire. Roman conquest of Greece.	10	9

		Pages :	No. of Lessons
III.	ROME : Origin of Rome. Conflict with Carthage. Early Roman Society : Particians and Plebeians ; Roman citizenship, Slavery and slave revolts (Spartacus). *Julius Caesar* : End of Roman Republic. New Empire. Eventual decline and fall. Rise of Christianity.	8	7
IV.	CHINA : "Great Shang". Confucius—his teachings. Building the Great Wall. The China Empire	3	2
V.	INDIA : (a) The coming of the Aryans (b) The Vedas. (c) Early Aryan Society, religion and political organisation (with reference to the Vedas). (d) The Epics. (e) The rise of Jainism and Buddhism. (f) The Empires —a brief outline of developments from the Mauryas—to the Kushans—to the decline of the Gupta Empire. (g) Ancient Bengal upto the decline of the Guptas (on the basis of proven historical materials viz. inscriptions and literary evidence). (h) Foreign contacts (particulary with Central Asia)—their impact upon society and trade. (i) Foreign Travellers—Megasthenes and Fa Hien—general picture of society as revealed in their accounts (in brief outlines only. (j) A brief summary of ancient Indian developments in arts and architecture, literature, education (Taxila and Nalanda), and Sciences (Astronomy, Mathematics, Chemistry, Medicine).	15	10

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমরা ইতিহাস পড়ি কেন

আমরা মানুষ। আমাদের মন আছে। সেই মনে কতকগুলো প্রশ্ন জাগে—কি, কেন, কবে, কোথায় এমনি আরও কত কি। পশু-পাখিদের সঙ্গে এখানেই আমাদের বড়ো তফাৎ। পশু-পাখিরা খেতে পেলেই খুশি। তাদের কৌতূহল নেই। তাই আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় নি, তারা পশুই থেকে গেছে। মানুষ বহুকাল পশুরই মত জীবন কাটিয়েছে। খাদ্যের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেই অসহায় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তার কৌতূহল তাকে ক্রমাগত নতুন নতুন আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের পথে নিয়ে গেছে। সে আগুন আবিষ্কার করেছে, চাষবাস শিখেছে, ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট তৈরি করেছে, গ্রাম ও শহরে পাঁচজনে মিলেমিশে বাস করতে শিখেছে। সভ্যতাও এমনি করে ধাপে ধাপে গেছে এগিয়ে। সভ্যতার জন্ম ও উন্নতির পেছনে আছে মানুষের অদম্য কৌতূহল, অজানাকে জানার ইচ্ছা। এই জানার ইচ্ছাটা সবচেয়ে বেশি তোমাদের। অজানার রাজ্য থেকে একটি একটি করে খবর কুড়িয়ে নিয়ে তোমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারটি ভরে ওঠে। তোমরা যখন খুবই ছোটো ছিলে তখন চিনতে কেবল বাবা-মাকে, ভাই-বোনকে। এখন তোমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়েছে। তোমাদের চেনার জগৎটাও হয়েছে অনেক বড়ো। আরও যখন বড়ো হবে তখন জানবে দেশ-বিদেশের মানুষের কথা। ইতিহাস না পড়লে কেমন করে জানবে সে-সব কথা! আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেও সভ্য মানুষ পৃথিবীতে বাস করত। তারা লিখতে জানত, তারা ছবি আঁকত, থালা-বাসন গড়ত, পাথর কেটে

সুন্দর-সুন্দর মূর্তি নির্মাণ করত। ইতিহাস পড়ে তবেই তো এসব কথা জানা যায়। প্রাচীনকালের এসব কথা না জানলে সভ্যতার পথে আমরা কতদূর এগিয়েছি, তাও ভালো করে বোঝা যাবে না। ইতিহাস থেকে আমরা নানাভাবে শিক্ষালাভ করি। ইতিহাসের কাহিনী আমাদের কঠিন কাজ করার প্রেরণা ও সাহস যোগায়, আমাদের মধ্যে একটি আদর্শবোধও গড়ে তোলে। তাই ইতিহাস না পড়লে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ

পুঁথি ঃ প্রাচীনকালের কথা জানা গেছে কেমন করে? একশো বা দু'শো বছর আগের কথা জানা খুব কঠিন কাজ নয়। লোকের মুখ থেকেও কিছু কিছু জানা যায়। তা ছাড়া, পুরনো পুঁথি, দলিলপত্র প্রভৃতি থেকেও সেকালের মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছবি পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বেদ এবং রামায়ণ-মহাভারতে কয়েক হাজার বছর আগেকার মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালী, চিন্তা, সমাজ-ব্যবস্থা, রীতিনীতি প্রভৃতির একটা আভাস মেলে। মহাকবি হোমারের লেখা দু'খানি মহাকাব্য 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' থেকেও তেমনি প্রাচীন গ্রীকজাতি সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। প্রাচীন ভারতে কাগজের কাজ চলতো তালপাতায় ও ভূর্জ-পত্রে। মিশরের মানুষ একরকম ঘাসের ডাঁটার টুকরো জুড়ে জুড়ে কাগজের মতো একটা জিনিস তৈরি করত। তার নাম প্যাপিরাস। আবার ব্যাবিলনের লোক নরম কাদার টালির ওপরে নরুণের মতো এক রকমের কলম দিয়ে লিখত। পণ্ডিতেরা বহু পরিশ্রম করে এসব প্রাচীন ভাষার পাঠোদ্ধার করেছেন।

লিপি ঃ মিশরে দেবতার মন্দিরের গায়ে ও পাথরে কিছু কিছু লেখা পাওয়া গেছে। ভারতেরও বহু জায়গায় অনেক রাজা পাহাড় বা স্তম্ভের গায়ে অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ের বহু শিলালিপি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে

আবিষ্কৃত হয়েছে। পাথর বা ধাতুর ফলকে খোদাই করা লিপিকে 'উৎকীর্ণ লিপি' বলে। রাজারা অনেক সময় ব্রাহ্মণকে জমি দান করতেন। সেই দানের কথা উৎকীর্ণ করা হোত তামার পাতে। এরকম দানপত্র থেকে সেকালের কয়েকজন রাজার নাম, রাজ-কর্মচারীদের পরিচয় এবং জমির দাম প্রভৃতি জানা গেছে। মধ্য এশিয়ার নানা জায়গা থেকে বহু কাঠের ফলক পাওয়া গেছে। এগুলোর ওপরে খরোষ্ঠী ভাষায় সরকারী নির্দেশ লেখা রয়েছে।

প্রাচীন মুদ্রা ঃ মাটির নিচে ও ওপরে প্রাচীনকালেব বহু মুদ্রা ভারতের নানা জায়গা থেকে পাওয়া গেছে। সেকালের এরকম টাকা ও মোহরে রাজা, রাজকর্মচারীদের নাম প্রভৃতি এবং দু'একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ আছে। কাজেই মুদ্রাও প্রাচীন ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।

প্রাগৈতিহাসিক কালের কথা ঃ কিন্তু মানুষের লেখা ইতিহাসের বয়েস তো খুব বেশি নয়! বড়ো জোর কয়েক হাজার বছর। অথচ পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে প্রায় গত পাঁচ লক্ষ বছর ধরে। সেই সুদূর অতীতকালের কথা জানার উপায় কি? কেমন করে তা জানা গেল, সে এক আশ্চর্য কাহিনী। বহু পণ্ডিত আজীবন পরিশ্রম করে মানুষের সেই অলিখিত ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন।

প্রত্নতত্ত্ব ঃ প্রাচীনকালের মানুষ ঘরবাড়ি, নানারকম যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, খেলনা, বাসনকোসন ও আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈরি করত। মাটি খুঁড়ে সেকালের মানুষের তৈরি এরকম বহু জিনিস পাওয়া গেছে। কোথাও পাওয়া গেছে জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের হাড় ও মাথার খুলি। পুরনো শহরের চিহ্ন, ভাঙা মন্দির, প্রাসাদ কোথাও বা কবর মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে বার করা হয়েছে। গুহার দেওয়ালে আবিষ্কৃত হয়েছে বিচিত্র সব শিকারের দৃশ্য। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ গ্রামে বাস করত, সেখানে মাটি জমে জমে বড়ো বড়ো সব ঢিবি হয়েছে। এসব ঢিবি খুঁড়ে পণ্ডিতেরা সেকালের সভ্যতার বহু নিদর্শনের সন্ধান পেয়েছেন। সেকালের আঁস্তাকুঁড়ের আবর্জনার মধ্যেও এরকম নিদর্শন মিলেছে। আর এসব নিদর্শন থেকেই

রচিত হয়েছে প্রাচীনকালের ইতিহাস। এ ধরনের চর্চাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব।

অনুশীলনী

১। ইতিহাস পড়ার উদ্দেশ্য কী? (তিনটি বাক্যে প্রকাশ কর)।

২। ঠিক উত্তরগুলো বেছে নিয়ে তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর:

(ক) ইতিহাস না পড়লে আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

(খ) ইতিহাস পড়ে আমরা ধর্মপরায়ণ হই।

(গ) ইতিহাসের কাহিনী আমাদের মধ্যে আদর্শবোধ গড়ে তোলে।

(ঘ) মানুষ অতি সহজে এবং অল্প সময়ে সভ্যতার পথে এগিয়ে গেছে।

(ঙ) পশুর সঙ্গে মানুষের কোন তফাৎ নেই।

৩। প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানগুলোর নাম কর।

৪। 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' কার রচনা?

৫। মাটি খুঁড়ে প্রাচীনকালের কী কী নিদর্শন পাওয়া গেছে?

৬। 'উৎকীর্ণ লিপি' কাকে বলে?

৭। 'প্রত্নতত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়?

৮। মধ্য এশিয়ার নানা জায়গা থেকে কী পাওয়া গেছে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ ও পাথর-যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

আদিম মানুষ

আমাদের এই পৃথিবীর বয়েস প্রায় তিনশো কোটি বছর হলেও মানুষ এখানে বসবাস করছে মাত্র গত পাঁচ লক্ষ বছর ধরে। প্রশ্ন উঠবে, তা হলে আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার মানুষ কি দেখতে-শুনতে, কথাবার্তায়, বুদ্ধিতে-বিবেচনায় ঠিক আমাদেরই মতো ছিল? উত্তরে বলব, মোটেই তা নয়। ইংরেজ বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষের উদ্ভব হয়েছে একরকম নরবানর থেকে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তবেই এক সময় নরবানর মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বিবর্তন বলা হয়।

পিকিং-মানুষ : চীনের পিকিং শহর থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এমন একটি গ্রামের নাম চাউ-কাউ-তিয়েন। এই গ্রামেরই একটি পাহাড়ের গুহায় আদিম মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে। ইংরেজ বিজ্ঞানী ডেভিডসন ব্ল্যাক এদের নাম দিয়েছেন পিকিং-মানুষ বা সিনানথ্রপাস। চেহারার দিক থেকে অনেকটা বানরের মতো হলেও, আর সব দিকে এরা ছিল মানুষ। দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে এরা স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারত। পিকিং-মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে।

আগুনের ব্যবহার : পিকিং-মানুষের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে, তারা আগুনের ব্যবহার জানত। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে এদের গুহা থেকে। আগুনকে বশে আনতে পেরে আদিম মানুষ নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অনেকখানি ক্ষমতা আয়ত্ত করে ফেলেছিল। একদিকে যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে তারা রেহাই পেয়েছে আগুন জ্বালিয়ে, তেমনি গুহার জমাট কালো

অন্ধকার দূর হয়েছে আগুনের আলোয়। আগুন দেখে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারেরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। কাঁচা মাংস আগুনে ঝল্‌সে নিয়ে খেতেও তাদের ভারি ভালো লেগেছে। প্রথম দিকে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে তারা গুহার মধ্যে রাখত, আগুন কিছুতেই নিব্‌তে দিত না। কাঠে কাঠ ঘষে বা চকমকি পাথর ঠুকে আগুন তৈরি করতে শিখেছিল তারা অনেক পরে। আগুনের আবিষ্কার সভ্যতার পথে মানুষের-যে প্রথম পদক্ষেপ, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

শিকার ও সংগ্রহের যুগ ঃ পিকিং-মানুষ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না। তারা জঙ্গল থেকে ফলমূল সংগ্রহ করে আনত বা জন্তু-জানোয়ার শিকার করত। আরও পরের দিকে আদিম মানুষ নদীতে মাছ ধরতেও শিখেছিল। কিন্তু খাদ্যের জন্যে তাদের নির্ভর করতে হোত পুরোপুরি শিকার ও সংগ্রহের ওপর। রোজই-যে শিকার জুটত এমন নয়। যেদিন জুটত না, সেদিন উপবাসেই কাটাতে হোত। খাদ্য যোগাড় করাই ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

মানুষের ক্রমবিকাশের কয়েকটি ধাপ ঃ পিকিং-মানুষ ছাড়াও সে যুগের আরেকটি সাক্ষ্য হোল জাভা-মানুষ, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে পিথিক্যানথ্‌্রপাস্‌। এর বহুকাল পরে আরো উন্নত পর্যায়ের
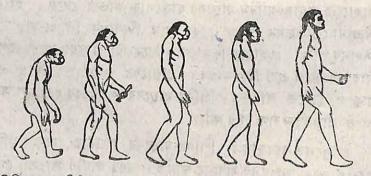
পিকিং-মানুষ পিথিক্যানথ্‌্রপাস নিয়াণ্ডারথ্যাল ক্রোমাগ্‌নন হোমো স্যাপিয়েনস

আর একদল মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এদের বলা হয় নিয়াণ্ডারথ্যাল মানুষ। এদেরও পরে সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে ক্রোমাগ্‌নন মানুষের। সে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর

আগের ঘটনা। হোমো স্যাপিয়েনস বা সমকালীন মানুষ পৃথিবীতে বাস করে গেছে আজ থেকে প্রায় পনের হাজার বছর আগে। আর এই সমকালীন মানুষই হচ্ছে আমাদের নিকট-পূর্বপুরুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরনো পাথর-যুগ

সময়কালের ধারণা : পুরনো পাথর-যুগ, নতুন পাথর-যুগ এসব বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে তোমাদের একটা মোটামুটি ধারণা থাকা উচিত। তোমাদের একটু আগেই বলেছি যে, পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে গত পাঁচ লক্ষ বছর ধরে। এই পাঁচ লক্ষ বছরের মধ্যে শেষ দিকের মাত্র পাঁচ হাজার বছর ছাড়া বাদবাকি সময়ে মানুষ ব্যবহার করেছে একমাত্র পাথরের হাতিয়ার; কাজেই ঐ সময়টাকে বলা হয় পাথর-যুগ। পাথর-যুগকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পাথর-যুগের বেশির ভাগ সময়টাই পড়ে পুরনো পাথর-যুগে। শেষদিকের কয়েক হাজার বছর নিয়ে নতুন পাথর-যুগ। যীশুখ্রীস্টের জন্মেরও প্রায় আট হাজার বছর আগে নতুন পাথর-যুগের শুরু। মেসোপটেমিয়া, মিশর বা ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে প্রায় একই সময়ে নতুন পাথর-যুগের শুরু হয়েছিল, কিন্তু ইয়োরোপে বেশ কিছুকাল পরে।

যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার : পাথর খুবই মজবুত, আদিম মানুষ তাই পাথর দিয়েই তাদের যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তৈরি করত। গোড়ার দিকে, তারা বড়ো একখণ্ড পাথর ভেঙে নিয়ে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে তারা বিশেষ প্রয়োজনের জন্যে বিশেষ হাতিয়ার তৈরি করতে লাগল। পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে আদিম মানুষের তৈরি হাত-কুড়ুল পাওয়া গেছে। হাত-কুড়ুল দিয়ে তারা নানা রকমের কাজ চালিয়ে নিত। সাধারণতঃ চকমকি পাথর (বা ফ্লিন্ট) থেকেই আদিম মানুষ হাতিয়ার তৈরি করত। পুরনো পাথর-যুগের মাঝামাঝি সময়ে হাতিয়ার তৈরির

কাজে মানুষ অনেকখানি দক্ষতা লাভ করেছিল। বড়ো একখণ্ড পাথর থেকে পাতলা পরত খসিয়ে নিয়ে তখন অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা হোত। পণ্ডিতেরা এরকম অস্ত্রশস্ত্রের নাম দিয়েছেন পরত পাথরের হাতিয়ার। ইউরোপের নিয়াণ্ডারথ্যাল মানুষ বর্শার ফলকের মতো একরকমের অস্ত্র দিয়ে ম্যামথ শিকার করত। পরে হাতিয়ার
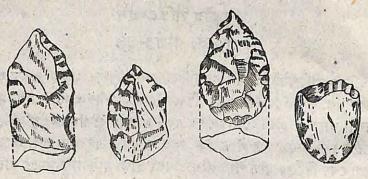
পুরনো পাথর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র

আরো উন্নত হয়েছে। জন্তু-জানোয়ারের হাড় ও শিঙ্ দিয়ে মানুষ হাতিয়ার তৈরি করেছে। হাড় ও শিঙ্ ফুটো করার জন্যে তুরপুন, কাঁটা, চেরা ও চাঁছার জন্যে পাথরের বাটালি প্রভৃতি এ যুগেই তৈরি হয়েছে। পুরনো পাথর-যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বর্শা আর তীর-ধনুক। লাঠির ডগায় হাল্কা হাড়ের ফলক লাগিয়ে বর্শা তৈরি করা হোত। পুরনো পাথর-যুগের মানুষ বর্শা দিয়ে শিকার করত বুনো ঘোড়া, বাইসন, বল্‌গা হরিণ প্রভৃতির মতো সব জন্তু-জানোয়ার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন পাথর-যুগ (৮০০০ খ্রীঃ পূঃ)

উন্নত ধরনের হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি : নতুন পাথর-যুগের হাতিয়ারকে ঘষেমেজে অনেক ধারালো করা হয়েছে। এ যুগে পালিশ করা কাঠের হাতল লাগানো পাথরের হাত-কুড়ুল তৈরি হয়েছে। এই কুড়ুল দিয়ে বাগিচার মাটি আলগা করা হোত। এ রকমের

বাগিচা-চাষ করত সাধারণত মেয়েরা। পাথরের কুড়ুল দিয়ে মাটিও কোপানো যেত। কাস্তেও তৈরি হয়েছে নতুন পাথর-যুগে। নতুন
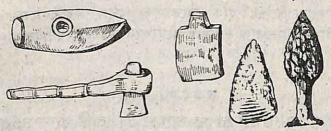
নতুন পাথর-যুগের অস্ত্রশস্ত্র

পাথর-যুগের আরো নানা রকম অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে একটির নাম ব্লেড বা ফলা, পাথরের হাতিয়ার।

কৃষিকাজ: নতুন পাথর-যুগেই মানুষ প্রথম কৃষিকাজ করতে শেখে। গোড়ার দিকে কৃষিকাজ বলতে বোঝায় বাগিচা-চাষ। একটা লাঠি বা শিঙ্ দিয়ে মাটি একটু আল্‌গা করে দেওয়া হোত। এর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হোত বীজ। সত্যিকারের চাষ শুরু হয়েছিল পাথরের লাঙ্গল আবিষ্কারের পর থেকে। কৃষিকাজ আদিম মানুষের জীবনে একটা বড়ো রকমের বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কৃষিকাজের সূচনায় ছিল গম ও বার্লির চাষ। এই বিপ্লবের শুরু হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়, মিশরে এবং পশ্চিম ভারতে।

কৃষি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সংগ্রহ করার অনিশ্চয়তা থেকে মানুষ মুক্তি পেল। আগে খাদ্যের সন্ধানে তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হোত। কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার পর তারা একটা জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগল।

পশুপালন: নতুন পাথর-যুগেই মানুষ পশুপালন করতে শেখে। পশুদের মধ্যে কুকুরই প্রথম পোষ মানে। শিকারীকে নির্ভুল শিকারের সন্ধান দিতে পারত কুকুর। এ কাজে তার জুড়ি ছিল না। পরবর্তী কালে বুনো ছাগল, বুনো ভেড়া আর বুনো ষাঁড়কে পোষ মানানো হয়। প্রথম দিকে মানুষ পশুপালন করত নেহাতই মাংসের লোভে। বহুকাল পরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পেরেছিল যে, পশুপালন করলে তারা নানাদিক থেকে লাভবান

হতে পারে। গৃহপালিত পশু থেকে শুধু মাংসই নয়, দুধের মতো পুষ্টিকর খাদ্যও তারা পেতে লাগল। পশুর লোম থেকে কাপড় বুনে তারা শীতের হাত থেকে রক্ষা পেল। কৃষিকাজের মতো পশুপালনও মানুষকে সভ্যতার পথে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নতুন পাথর-যুগের আরো কয়েকটি বড়ো ঘটনা

পুরনো পাথর-যুগ থেকে নতুন পাথর-যুগে মানুষকে যেতে হয়েছে একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। এ বিপ্লবের প্রকাশ ঘটেছে কৃষিকাজ ও পশুপালনে। কৃষি ও পশুপালনের মতোই উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল এ যুগে। তখন এক অঞ্চলের জন্তু-জানোয়ার ফুরিয়ে গেলেই খাদ্যের সন্ধানে মানুষকে আর একটি অঞ্চলে চলে যেতে হোত। এরকম অস্থির যাযাবর জীবনে সুতো কাটা, কাপড় বোনা, মাটির পাত্র তৈরি করার মতো কাজের কোনো স্থান ছিল না। নতুন পাথর-যুগে কৃষি ও পশুপালনের মধ্য দিয়ে খাদ্যের সমস্যা আর তেমন রইল না। ফলে তাদের অবকাশও তখন বাড়ল। পুরনো পাথর-যুগেই মানুষ গাছের ছাল দিয়ে চুবড়ি বুনতে পারত। কিন্তু পোড়ামাটির পাত্র তৈরি করতে মানুষ প্রথম শিখল নতুন পাথর-যুগেই।

পোড়ামাটির পাত্র : পোড়ামাটির পাত্র প্রথম তৈরি হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায়। কৃষির মতো এ কাজটিও ছিল গোড়ার দিকে মেয়েদের হাতে। পোড়ামাটির পাত্রের ওপরে নানা রঙের অলঙ্করণ করার কৌশলটি মানুষ ধীরে ধীরে আয়ত্ত করেছিল। কুমোরের চাকা আবিষ্কার হয়েছে আরো পরে।

কাপড় বোনা : নতুন পাথর-যুগের আর একটি কৃতিত্ব কাপড় বোনা। এ কাজটিও করত মেয়েরা। পুরনো পাথর-যুগেই মানুষ চামড়া ও পাতার পোশাক তৈরি করতে শিখেছিল; নতুন পাথর-যুগে এসে তারা সুতোর ও পশমের পোশাক তৈরি করতে শিখল। এ যুগেই প্রথম সত্যিকারের তাঁত তৈরি হয়েছিল।

কুটির ও দালান ঃ স্থায়িভাবে বাস করতে গেলে ঘরবাড়ি তৈরি করতে হয়। নতুন পাথর-যুগে মানুষ এ কাজটিতে পিছিয়ে থাকে নি। পুরনো পাথর-যুগের শেষ দিকেই মানুষ কাঠের গুঁড়ি সাজিয়ে কুটির তৈরি করত আবার জলাভূমির উপরে মাচা তুলেও কুটির তৈরি করত। নতুন পাথর-যুগের প্রথমদিকে মাটি-লেপা নলখাগড়ার বেড়া দিয়ে তারা কুটির তৈরি করত। পরে রোদে শুকিয়ে নেওয়া ইট দিয়ে দালান-কোঠা তৈরি করে তাতে বাস করত।

গ্রাম ঃ স্থায়িভাবে বসবাস করার ফলে গড়ে উঠল ছোটো ছোটো গ্রাম। পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে ঢিবি খুঁড়ে এরকম প্রাগৈতিহাসিক গ্রামের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মানুষ নানা কারণে এক জায়গায় গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে শিখেছিল। গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি পরিবার নিয়ে এক-একটি গ্রাম গড়ে উঠত। গ্রামের চারধারে গভীর পরিখা কাটা হোত। তারপর খুঁটির বেড়া দিয়ে গ্রামটিকে ঘিরে দেওয়া হোত। হিংস্র পশু এবং মানুষ-শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই তারা এসব ব্যবস্থা করত। এ যুগে বেঁচে থাকার তাগিদেই পাঁচজনকে একসঙ্গে চলতে হোত, একত্র হয়ে কাজ করতে হোত।

যানবাহন ঃ নতুন পাথর-যুগ আরম্ভ হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই চাষীদের হাতে বাড়তি শস্য মজুত হয়েছিল। তারা সেই উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনের জিনিস সংগ্রহ করতে লাগল। মানুষ তখন আর বিশেষ একটি অঞ্চলের মধ্যে আটকে রইল না। এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে যাতায়াত শুরু করল। যানবাহন বলতে প্রথম দিকে ছিল গাধা। গাধার পিঠে চড়ে মানুষও যেমন যেত, তেমনি মালপত্র চাপিয়ে দেওয়া হোত। কিছুকাল পরে ঘোড়াও যানবাহনের মাধ্যম হয়ে উঠল। এ যুগের আর একটি বড়ো আবিষ্কার হোল চাকাওয়ালা গাড়ি। ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগেই সুমেরে চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন হয়েছিল। চাকাওয়ালা গাড়ির কোনোটা যাত্রী বহন করত, আবার কোনোটা মাল বহন করত। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে ডোঙা তৈরি করতে মানুষ শিখেছিল আগেই। তারপর নলখাগড়ার আঁটি একত্র করে বেঁধে ভেলা তৈরি করত।

ভেলায় চড়েই তারা নদী পারাপার করত। এরও অনেক পরে পালতোলা নৌকার প্রচলন হয়। ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আরব-সাগর ও ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে রীতিমতো পালতোলা নৌকোর যাতায়াত শুরু হয়ে যায়।

আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস: কৃষি ও পশুপালনের যুগে মানুষ নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করত ঠিকই, কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে তবুও তারা ছিল অসহায়। খরা, ঝড়, শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, মড়ক ও মহামারী—এসবের যে-কোনো একটা এসে তাদের সারাবছরের পরিশ্রমকে ব্যর্থ করে দিত। তাই এসব শক্তিকে তারা নানা মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ ও পুজো-আর্চা করে খুশি করার চেষ্টা করত। তারা ভাবত, নদীর দেবতা খুশি থাকলে আর বন্যা হবে না। ক্ষেতের দেবতা খুশি থাকলে ফসল নষ্ট হবে না। এমনি আরও কত কি। এ থেকেই গড়ে উঠেছিল অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার। আদিম মানুষ পরলোকে বিশ্বাস করত। তাই মৃত পূর্বপুরুষদের কবরে তাদের ব্যবহারের উপযোগী সব রকমের জিনিসই তারা রেখে দিত। মৃতদেহ কবর দেবার সময় তার দেহে লালরঙের প্রলেপ লাগানো হোত। এমনি আরও অনেক নিয়ম এবং অনুষ্ঠান তারা পালন করত। জাদু-শক্তির ওপর আদিম মানুষের ছিল প্রবল বিশ্বাস। স্পেনের আলতামিরা গুহায় লাল আর কালো রঙে আঁকা একপাল বাইসনের ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালিতে এরকম আরো কয়েকটি গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব গুহাচিত্র আদিম মানুষের শিল্পকর্ম তো বটেই, এ সবের মধ্যে আবার তাদের জাদুবিশ্বাসেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

স্পেনের আলতামিরার গুহাচিত্র

ভাষা: নতুন পাথর-যুগের মানুষকে একজোট হয়ে বহু কাজ করতে হোত। কাজেই তারা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে নিশ্চয়ই কথা বলত। ঐ সময় থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে

যাতায়াত ও লেনদেনেরও শুরু হয়। আদিম মানুষ কথা বলতে পারত বলেই তার পক্ষে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজকর্ম করা, লেনদেনের মাধ্যমে জিনিসপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

ফসল দেবীর পূজা : নতুন পাথর-যুগের মানুষের সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল মাঠের ফসলের ওপরে। ফসল ফলাবার জন্যে তারা নানা রকম অনুষ্ঠান পালন করত। তারা কল্পনা করত ফসলের জমি যেন মা, আর ফসল হচ্ছে সন্তান। মায়ের প্রতীক হিসেবে নারীমূর্তি গড়া হোত মাটি, পাথর বা হাড় দিয়ে। মিশর, সিরিয়া, ইরান এবং পূর্ব ইয়োরোপের বহু জায়গায় এরকম অজস্র মূর্তি পাওয়া গেছে।

আদিম মানুষের মধ্যে আরেকটি অনুষ্ঠানও খুব প্রচলিত ছিল। তা হচ্ছে 'ফসলরাজার বিয়ে'। প্রতি বছরই একজন তরুণকে বেছে নিয়ে ফসলরাজা করা হোত। তারপর তাকে বিয়ে দেওয়া হোত বাছাই করা কোনো তরুণীর সঙ্গে। কিন্তু বছর ঘুরতেই ফসলরাজাকে মেরে ফেলে তার মৃতদেহকে খুব ঘটা করে কবর দেওয়া হোত। আদিম মানুষ বিশ্বাস করত ফসলরাজার দেহটিকে মাটিতে পুঁতে দিলেই জমিতে ভাল ফসল ফলবে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) পৃথিবীর বয়েস কত ?

(খ) পৃথিবীতে মানুষ বাস করছে কতদিন ধরে ?

(গ) চার্লস ডারউইন কী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ?

(ঘ) 'পিকিং-মানুষ' নামটি কে দিয়েছেন ?

(ঙ) 'পিকিং-মানুষ'-যে আগুনের ব্যবহার জানত, তা বোঝা গেল কী ভাবে ?

(চ) সভ্যতার পথে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ কী ?

(ছ) ক্রোমাগ্‌নন মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল কবে ?

২। বিবর্তন বলতে কী বোঝায় ?

৩। 'পিকিং-মানুষ'-এর পরিচয় দাও।

৪। আগুনকে বশে আনতে পারায় মানুষের কী লাভ হয়েছিল ?

৫। ‘পিকিং-মানুষ’ খাদ্য সংগ্রহ করত কী ভাবে ?

৬। ‘পিকিং-মানুষ’-এর পরে যেসব মানুষের আবির্ভাব, তাদের পরিচয় দাও।

৭। পাথর-যুগ বলা হয় কোন্ সময়টাকে ?

৮। নতুন পাথর-যুগের শুরু হয়েছে কোন্ সময়ে ?

৯। পুরনো পাথর-যুগের হাতিয়ার সম্বন্ধে কী জান ?

১০। আদিম মানুষ সাধারণত কোন্ ধরনের পাথর দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত ?

১১। আদিম মানুষ বর্শা তৈরি করত কী ভাবে ?

১২। নতুন পাথর-যুগের হাতিয়ারের বিশেষত্ব কী ?

১৩। বাগিচা-চাষ বলতে কী বোঝায় ? কারা বাগিচা-চাষ করত ?

১৪। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার ফলে আদিম মানুষের যাযাবর জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল ?

১৫। মানুষের প্রথম পোষা জীব কী ?

১৬। আদিম মানুষ কখন্ পোড়ামাটির পাত্র বানাতে ও কাপড় বুনতে শেখে ? এ বিষয়ে তুমি কী জান ?

১৭। নতুন পাথর-যুগে মানুষ কী ভাবে দালান তৈরি করত ?

১৮। আদিম যুগের যানবাহন সম্বন্ধে কী জান ?

১৯। আদিম মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু’চার কথা বল।

২০। আদিম মানুষ ফসল ফলাবার জন্য যে-সব অনুষ্ঠান পালন করত, তার মধ্যে দু-একটির নাম কর।

২১। বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) আমাদের নিকট-পূর্বপুরুষ হচ্ছে——মানুষ। (নিয়াণ্ডারথ্যাল/সমকালীন/পিকিং)

(খ) পুরনো পাথর-যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার——। (বর্শা/তুরপুন/কুড়ুল/তীর-ধনুক)

(গ) মানুষ কৃষি করতে শেখে——যুগে। (লৌহ/পুরনো পাথর/নতুন পাথর)

(ঘ) পোড়ামাটির পাত্র প্রথমে তৈরি হয়েছিল——। (ইয়োরোপে/পশ্চিম এশিয়ায়)

(ঙ) তাঁতের আবিষ্কার করেছে——মানুষ। (পুরনো পাথর-যুগের/লৌহ-যুগের)

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধাতুর আবিষ্কার ও নগরের উদ্ভব

পাথরের যুগের পরেই ধাতুর যুগ। পাথরের যুগের বয়সের তুলনায় ধাতুর যুগের বয়স কিছুই নয়। আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে মানুষ তামার আবিষ্কার করে, আর লোহার আবিষ্কার হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে। দু' হাজার বছর ধরে মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার করেছে। সেজন্যে ঐ সময়টাকে বলা হয় তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ। এর পরেই লৌহযুগ। আমরা এখনও লৌহযুগেই বাস করছি।

তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কার ঃ মানুষ কেমন করে প্রথমে তামা গলাতে শিখেছিল, তা আমরা জানি না। ঘটনাটি হয়তো নিতান্তই আকস্মিক। তবে যেমন করে ঘটুক না কেন, এই আবিষ্কার তৎকালীন মানুষের চিন্তা ও কল্পনাকে একেবারে ওলট-পালট করে দিয়েছিল। পাথরের হাতিয়ার মজবুত হলেও তা আচম্কা ভেঙে যেতে পারে। আর ভেঙে গেলেই তা প্রায় অচল। তামার হাতিয়ারের বেলা এ কথা খাটে না। তাকে গলিয়ে নিলেই আর একটি নতুন হাতিয়ার তৈরি করা যায়। তামার মতো ব্রোঞ্জের আবিষ্কারও একটি আকস্মিক ঘটনা। তামা ও টিন একসঙ্গে গলিয়ে নিলেই যে-সংকর ধাতুটি পাওয়া যায়, তার নাম ব্রোঞ্জ। ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র ও বাসন-কোসন তামার চেয়েও শক্ত, সুতরাং মজবুত।

নগরের উদ্ভব ঃ পাথর-যুগ পেছনে ফেলে মানুষ ধাতুর যুগে পা ফেলেছে। তবে একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একাজ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা একে নগর-বিপ্লব বলতে পারি। ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়া, মিশর এবং ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে কয়েকটি নগর গড়ে উঠেছিল। পাথর-যুগে যেগুলো ছিল স্বয়ং-

সম্পূর্ণ গ্রাম, পরে সেগুলোই নগরে পরিণত হয়। নগরগুলোই হয়ে ওঠে শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র।

নতুন কারিগর-শ্রেণীর উদ্ভব ঃ তামার আবিষ্কারের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল। এই ধাতুটিকে কেন্দ্র করে এক নতুন কারিগর-শ্রেণীর উদ্ভব হোল, এদের নাম কামার। তামা গলিয়ে এরা ব্যবহারের উপযোগী নানা রকম যন্ত্রপাতি গড়ে, তৈরি করে নানা রকমের হাতিয়ার। খনি থেকে আকরিক তামা তুলে আনে আরেক দল। অপর এক দল আকরিক তামা গলিয়ে বিশুদ্ধ তামা সংগ্রহ করে। ফলে নতুন নতুন কারিগর-গোষ্ঠীর উদ্ভব হোল। এরা চাষবাস করার সময় পেত না। উদ্বৃত্ত ফসল থেকেই এদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হতে লাগল। এতদিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সকলকে কিছু না কিছু চাষের কাজ করতে হোত। এজন্যে ফসলে ছিল সকলের সমান অধিকার। সমাজে এই প্রথম নতুন কিছু মানুষের দেখা পাওয়া গেল যারা চাষ ছাড়া অন্য কাজ করেও স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্বাহ করতে পারে। তামার কারিগরদের চাষীদের মতো গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে থাকতে হোত না। তাদের কাজের চাহিদা ছিল খুবই। ফলে তারা প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাণিজ্য, শ্রেণীর উদ্ভব ও রাজতন্ত্রের ধারণা

লেনদেন ঃ কৃষি ও পশুপালনের যুগ থেকেই গ্রামের চাষীদের সঙ্গে যাযাবর পশুপালকদের একটা লেনদেন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পশুপালকদের কাছ থেকে চাষীরা পেত মাছ, মাংস এবং আরো কিছু কিছু জিনিস, আর পশুপালকরা পেত শস্য। ধাতু আবিষ্কারের পর থেকে এই লেনদেনের সম্পর্ক আরও উন্নত হয়। মিশরের বহু কবর থেকে সবুজ রঙের তামা, রজন, রঙ-বেরঙের নানা রকম পাথর, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সামুদ্রিক জীবের খোলা প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

এগুলোর কোনোটাই খাস মিশরের নয়, আনা হয়েছিল দূরবর্তী সব অঞ্চল থেকে। যে-ক'টি পলিমাটি অঞ্চলে সভ্যতার জন্ম হয়েছে, সেখানে তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত না, আনতে হোত বাইরে থেকে। পরবর্তী কালে নগর পত্তনের পরে দেবমন্দিরের প্রয়োজনে বহু জিনিসই বাইরে থেকে আনতে হোত। আর সত্যিকারের ব্যবসা-বাণিজ্যের তখন থেকেই শুরু। উদ্বৃত্ত ফসল আর গৃহপালিত জন্তু বিনিময় করেই লেনদেন হোত।

বাণিজ্য: ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলে ছিল উদ্বৃত্ত ফসল। আদিম সমাজে ফসল ফলাবার কাজে সকলেই ছিল অংশীদার।

বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব: ধাতু আবিষ্কারের পর থেকে এ ব্যবস্থাটিতে পরিবর্তন ঘটল। কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, রাজমিস্ত্রী সকলেরই জীবিকা আলাদা হয়ে গেল। সমাজে এইভাবে নানা শ্রেণীর উদ্ভব হোল। ফলে, আদিম সমাজের সাম্য আর রইল না। আদিম সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে ছিল দিন-আনা-দিন-খাওয়ার মতো একটা অবস্থা। কাজেই তখন সকলে মিলে যা তৈরি করত, তা হয়ে উঠত সকলেরই সম্পত্তি। সেখানে সকলেই ছিল সমান; কেউ প্রভুও নয়, আবার কেউ দাসও নয়। অনেকগুলো গোষ্ঠী একত্র হওয়ার ফলে যখন একটি বড়ো দল বা ট্রাইব গড়ে উঠত, তখনও এমন অবস্থাই ছিল। সেখানে কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। কাজ ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই কিন্তু মানুষ একটা সমৃদ্ধির যুগে পা দিয়েছিল। তখন তারা সোনা, রূপা ও মণি-মুক্তোর অলঙ্কার ব্যবহার করতেও মোটামুটি শিখেছে। জীবনধারণের উপায় উন্নত হয়ে ওঠার ফলে মানুষের পরিশ্রম উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে লাগল। অল্প কিছু লোকের হাতে এই উদ্বৃত্ত জমা হতে লাগল। আর সেই উদ্বৃত্ত ফসল ফলাবার কাজে চাষীকে উদয়াস্ত মেহনত করতে হোত। এই সময় থেকেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভব হয়। সেই সমাজে একদল শোষক, আর একদল শোষিত, একদল প্রভু, আর একদল দাস।

গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ: ইরান, মেসোপটেমিয়া ও মিশরে মাটি খুঁড়ে যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা দেখে মনে হয় গোষ্ঠীতে

গোষ্ঠীতে মাঝে মাঝে সাংঘাতিক রকমের যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে। লোক-সংখ্যা এক সময়ে খুবই বেড়ে গিয়েছিল। কাজেই বাড়তি লোকের জন্যে নতুন জমির দরকার। এইসব যুদ্ধবিগ্রহ ছিল জমিদখলের লড়াই। যেমন জমি নিয়ে লড়াই চলতে লাগল, তেমনি চলতে লাগল লুটপাট। যুদ্ধে পরাজিত গোষ্ঠীর অনেকেরই প্রাণ গেল। যারা বেঁচে রইল, তারা বিজয়ী গোষ্ঠীর দাস হয়ে খাটতে লাগল। দাসত্ব প্রথা এভাবেই কায়েম হোল। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের সবাই মিলেমিশে কাজ করত; তাদের অধিকারও ছিল সমান। তার জায়গায় দেখা দিল নতুন একটা সামাজিক সম্পর্ক। একদল প্রভু আর একদল দাস।

রাষ্ট্রের উদ্ভব: গোড়ার দিকে যে-মানুষ যে-উপকরণটি তৈরি করত, সেই মানুষটিই তা ভোগ করত। কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের শুরু হবার পর এ অবস্থাটা একেবারে পাল্টে গেল। পণ্য যারা তৈরি করত, তারা সেই পণ্য ভোগ করতে পারত না। পণ্যের মালিক ছিল অন্য আর এক দল লোক। ব্যবসা-বাণিজ্য করে পণ্যের মালিকরা বিত্তবান হতে লাগল। আর যাদের পরিশ্রমে সেই পণ্য তৈরি হোত, তারা বিত্তহীন হতে লাগল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ফুলে-ফেঁপে উঠল এভাবেই। আর এমন একটা ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নিয়মকানুন তৈরি করা হোল। আবার সেই সব নিয়মকানুন যাতে সকলে মেনে চলে তার জন্যে সৈন্য-সামন্তও মজুত রাখা হোল। সব মিলিয়ে এই ব্যবস্থাটির নাম দেওয়া যেতে পারে রাষ্ট্র। নগর গড়ে ওঠার পরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেক সময় বিজয়ী কোনো দলের দলপতি রাজা হয়ে বসত। আবার মানুষের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে কখনও কখনও বুদ্ধিমান্ কোনও পুরোহিত রাজপদ লাভ করত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নদী-উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশ

পৃথিবীর বড়ো বড়ো কয়েকটি নদীর উপত্যকায় প্রথমে নগরের পত্তন হয়। নীলনদের দেশ মিশরে, টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর
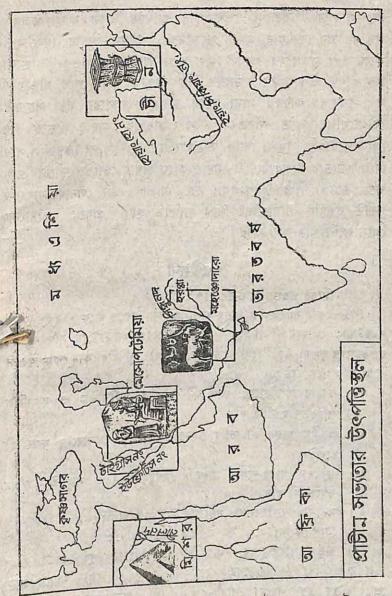
মধ্যবর্তী অঞ্চল মেসোপটেমিয়ায় এবং সিন্ধুনদের উপত্যকায় তাই মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সভ্যতার আর একটি প্রাচীন কেন্দ্র ছিল চীন। চীন দেশটিও হোয়াংহো আর ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকা অঞ্চল। এদের সবগুলোই পলিমাটির দেশ। মাটি এমনই উর্বরা

যে, সামান্য পরিশ্রমেই সেখানকার জমিতে প্রচুর ফসল ফলত। পশুদের চরে বেড়াবার মতো তৃণভূমিরও সেখানে অভাব ছিল না। ফলে, শুধু কৃষকদের পক্ষেই নয়, পশুপালকদের পক্ষেও জায়গাগুলো ছিল খুবই উপযোগী। ডাঙ্গার পথ ছাড়াও নদীর পথে যাতায়াত করা যেত। কাজেই নানা দলের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারত। এসব কারণেই নদীর স্নেহে পুষ্ট মেসোপটেমিয়া, মিশর আর ভারতবর্ষের পাঞ্জাব এবং কিছুকাল পরে চীনে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। নদীর কাছে প্রথমে ছোটো ছোটো গ্রাম গড়ে ওঠে। পরে লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং লেনদেন-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় গ্রামগুলো নগরে পরিণত হয়। প্রথমে তোমাদের মেসোপটেমিয়ার কথা বলব।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) কোন্ সময় থেকে মানুষ ধাতুর ব্যবহার করতে থাকে ? (খ) কোন সময়টাকে লৌহযুগ বলা হয় ? (গ) পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে তামার হাতিয়ারের তুলনা কর। (ঘ) ব্রোঞ্জ কী ? (ঙ) পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে প্রথম নগর গড়ে ওঠে ?

২। তামার আবিষ্কারের ফলে কী ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল ?

৩। আদিম মানুষ কী ভাবে লেনদেন করত ? লেনদেনের ফলে কী হয়েছিল ?

৪। পুরনো পাথর-যুগের মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কী জান ?

৫। নদী-উপত্যকাগুলোতে সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল কেন ?

৬। 'হ্যাঁ' কি 'না' বলে ঠিক উত্তরটি বেছে দেখাও :

(ক) নতুন পাথর-যুগের মানুষের খাওয়া-পরার খুব একটা চিন্তা ছিল কি ? (খ) পাথর-যুগের পরেই ধাতুর যুগ। (গ) সমাজে নানা শ্রেণীর উদ্ভব হয় পুরনো পাথর-যুগে। (ঘ) অনেকগুলো গোষ্ঠী মিলে ট্রাইব গড়ে ওঠে। (ঙ) জমিদখলের জন্যে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে মাঝে মাঝে লড়াই হোত।

৭। কী অবস্থায় এবং কখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে ?

৮। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষের ফলে কী হোত ?

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর প্রাচীনতম কয়েকটি সভ্যতা

(৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মেসোপটেমিয়া

অবস্থান : যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। এমনই একটি অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া। নামটি গ্রীকদের দেওয়া।

নামটির অর্থ দোয়াব বা দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। আরবের মরুভূমির উত্তরে দুটি নদীর নাম টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস। দুটি নদীর দোয়াব হল মেসোপটেমিয়া।

প্রাচীনকালের মেসোপটেমিয়াই হোল বর্তমানের ইরাক। মেসোপটেমিয়ার উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে এলবুর্জ এবং জ্যাগ্রস পর্বতশ্রেণী ও ইরানের মালভূমি, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং পশ্চিমে সিরিয়ার মরুভূমি।

প্রাচীনকালে মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশকে বলা হোত অসুর বা আসিরিয়া; দক্ষিণাংশের নাম ছিল ব্যাবিলোনিয়া। ব্যাবিলোনিয়ার

উত্তর দিকের খানিকটা অংশ নিয়ে ছিল আক্কাদ রাজ্য। আর দক্ষিণ ভাগের নাম ছিল সুমের।

অনেকের মতে সুমেরের সভ্যতাই সবচেয়ে প্রাচীন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে এই সভ্যতার জন্ম হয়েছিল।

ভু-প্রকৃতি ও জলবায়ু: পলিমাটির দেশ বলেই সুমেরের জমি ছিল খুবই উর্বর। জমিতে বীজ ফেললেই সোনা ফলত। কিন্তু বৃষ্টিপাত ছিল খুবই কম, আর জলবায়ু ছিল মরুভূমির মতোই। তা ছাড়া, গোটা দেশ জুড়ে ছিল অসংখ্য জলাভূমি, আর তাতে ছিল কেবল নলখাগড়ার জঙ্গল। সেখানে কিছুই জন্মাত না। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীতে প্রতি বছরই ভয়ঙ্কর বন্যা হোত। আর সেই বন্যায় মানুষের ঘর-বাড়ি, গরু-বাছুর সব কিছু যেত ভেসে। সুমেরের মানুষ কিন্তু এইসব বিরুদ্ধ-শক্তির কাছে হার মানে নি। হার মানে নি বলেই সেখানে সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর মধ্যে এখানেই মানুষ প্রথম ষাঁড়ের সাহায্যে লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করেছে। এখানে প্রথম গম ও বার্লির চাষ হয়। ক্ষেতে প্রচুর গম ও বার্লি ছাড়াও জন্মাত নানা রকমের ডাল। বাগানে ফলত ডুমুর, আপেল, আখরোট, পেস্তা, বাদাম, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল। সবচেয়ে বেশি জন্মাত খেজুর গাছ। সুমেরীয়রা ছিল খুবই পরিশ্রমী।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা: বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের জন্যে তারা চমৎকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। নদীর মধ্যে জায়গায় জায়গায় পাথর দিয়ে তারা বাঁধ তৈরি করত। তাতে বন্যার জল আটকা পড়ে কয়েকটি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর অসংখ্য খাল কেটে সেই জল তারা নিয়ে গিয়েছিল দেশের চারদিকে। ফলে বন্যার জল নানা পথে বেরিয়ে যেতে পারত। অজস্র নালা কেটে বন্যার জল নিয়ে যাওয়া হোত ফসলের জমিতে। এ ব্যবস্থায় সারা বছরই চাষের কাজ ভালভাবে চলত। বৃষ্টির জন্যে তাদের হা-পিত্যেশ করতে হোত না। জলসেচের এই সুন্দর পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক সেচ-ব্যবস্থার কোনো তফাৎ নেই। জলাভূমির জল নিকাশ করে এবং নলখাগড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করে তারা বহু জমি চাষযোগ্য করে নিয়েছিল। সেইজন্য, সুমেরীয়দের খাদ্যের কোনও অভাব ছিল না।

অন্যান্য পেশা : সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি ও পশু-পালন। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল গোরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি। কৃষির মতো অন্যান্য কাজেও সুমেরীয়রা সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর পাত্র তৈরি করতে জানত। ঐসব পাত্রের ওপর নানারকম অলঙ্করণও করা হোত। পশম আর পাটের সুতো দিয়ে তারা কাপড় বুনত; রোদে খুব শক্ত করে শুকিয়ে নেওয়া ইট দিয়ে দালানকোঠা তৈরি করত; সোনারূপা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে অলঙ্কার তৈরি করত এবং তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা রকম যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তৈরি করত। হাতির দাঁত, দামী কাঠ এবং পাথরের সূক্ষ্ম কাজেও তারা দক্ষ ছিল।

সুমেরীয়রা মাস ও বছর গণনা করতে জানত। দেশের পুরোহিতরাই এ কাজে অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা শুধু জ্ঞানের চর্চাই করতেন না, জ্ঞান বিতরণও করতেন। মন্দিরগুলো ছিল এক-একটি পাঠশালা। সুমেরের সৈনিকরা ছিল খুবই সাহসী। মাথায় তামার শিরস্ত্রাণ পরে কুঠার, বর্শা আর ঢাল নিয়ে তারা যুদ্ধ করত।

নগর-বিপ্লবের জন্মভূমিও সুমের : সুমের দেশে ছোটো ছোটো গ্রাম থেকে ক্রমশঃ শহর গড়ে উঠতে থাকে। উরুক, এরিডু, উর, লগস, কিশ প্রভৃতি ছিল এরকম কয়েকটা শহর। প্রতিটি শহর ছিল এক-একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, তাদের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। সুমেরীয়রা তাদের উদ্বৃত্ত ফসল দিয়ে দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত।

সুমেরীয়দের কৃতিত্ব : সুমেরেই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সেখানকার লোক নানা রকম কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। নানা দেব-দেবীতে তারা বিশ্বাস করত। এনলিল ছিল পৃথিবীর দেবতা, অনু আকাশের দেবতা, এয়া জলের দেবতা, সামাস সূর্য দেবতা এবং নান্নার চন্দ্র দেবতা। প্রত্যেকটি নগরের মাঝখানে তারা বিশাল বিশাল দেবমন্দির নির্মাণ করত। এরকম দেবমন্দিরের নাম জিগ্‌গুরাট। এই নগরদেবতার মন্দিরগুলো দেখতে ছিল অনেকটা গম্বুজের মতো। দেবমন্দিরের মধ্যেই থাকত শস্যের গোলা, অস্ত্রাগার এবং কামারশালা।

দেবমন্দিরের বাইরে ছিল কাঁচা ইটের সব বসত-বাড়ি। তাতে কামার, কুমোর, তাঁতী, ছুতোর প্রভৃতি নানা রকমের কারিগর বাস করত।

ব্যবসা-বাণিজ্য : সুমেরীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুবই উন্নতি করেছিল। নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠার পর থেকে সেখানে তামা, পাথর এবং দামী কাঠের চাহিদা খুবই বেড়ে গিয়েছিল। অথচ এগুলোর কোনটাই সুমেরে পাওয়া যেত না, আনতে হোত বাইরে থেকে। নানা পথে সুমেরীয়রা দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। পারস্য উপসাগর দিয়ে তারা পশ্চিম ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত, আবার আর্মেনিয়া, সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গেও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। ইউফ্রেটিস নদীর আদি নাম 'উরুদু'। এর অর্থ তাম্রনদী। অর্থাৎ ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রীস নদীপথে বিপুল পরিমাণ পাইন কাঠ, সীডার কাঠ আর আকরিক তামা আসত মেসোপটেমিয়ায়। আরও যেসব জিনিস আমদানি করা হোত তার মধ্যে ছিল বিটুমেন আর নানা রকমের বিলাসদ্রব্য। এসব বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে থাকত দামী পাথর, প্রবাল, মুক্তো, হাতির দাঁতের চিরুনি।

পা			
গাধা			
পাখী			
মাছ			
তারা			
ষাঁড়			
সূর্য			
শস্য			

সুমেরীয় বাণমুখো লিপির ক্রমবিকাশ

চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন হয়েছিল সুমেরে। এসব গাড়ির কোনোটা ছিল যাত্রীবাহী, আবার কোনোটা মালপত্রও বহন করত। নদীপথে সুমেরীয় বণিকরা যাতায়াতের জন্যে নৌকো ব্যবহার করত। ভারী জিনিসপত্র নিয়ে বহুদূরের পথ পাড়ি দেবার জন্যে তারা বিশেষ এক ধরনের বাণিজ্যতরী নির্মাণ করেছিল।

সুমেরীয়দের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব লেখা ও লিপির আবিষ্কার। নরম টালির ওপর নরুণের মতো শক্ত এক রকমের কলম দিয়ে তারা লিখত। লেখার পর টালিগুলো রোদে শুকিয়ে নেওয়া হোত। সুমেরীয়দের লেখা এই হরফগুলো দেখতে অনেকটা তীরের ফলার মতো। সেইজন্যে এই লিপিকে বলা হয় বাণমুখো লিপি, কোণাকার লিপি বা কীলক লিপি। লিপিও একরকমের চিত্রলিপি। সুমেরীয়রা মাটির টালিতে চিঠিপত্র লিখত, হিসেব রাখত, এমন কি জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি কঠিন বিষয়ে বইও লিখত। সুমেরীয়দের ভাষা ও সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করে পরবর্তী কালে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে।

সুমেরীয় বাণমুখো বা কীলক লিপি

সুমেরু থেকে ব্যাবিলন: সুমেরীয়রাই পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার জনক। তেমনি সেমিটিক যাযাবরদের ছোটো রাজ্য আক্কাদের নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্যটি গড়ে ওঠে। ২৩৪০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সারগণ আক্কাদ রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আক্কাদ রাজ্যের এই রাজা ছিলেন মস্ত বড়ো বীর। এলাম, সুমের প্রভৃতি প্রতিবেশী রাজ্য জয় করে তিনি ছোটো আক্কাদ রাজ্যটিকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। সারগণের মৃত্যুর পর সুমেরীয়দের সঙ্গে সেমিটিকদের আবার বিবাদ শুরু হয়ে যায়। কয়েকশো বছর ধরে এরকম বিবাদ চলতে থাকে। এদিকে সেমিটিক জাতির নতুন একটি শাখার নেতৃত্বে ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী ব্যাবিলন শহরে একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনের সিংহাসনে বসেন। গোটা দোয়াবটিই (মেসোপটেমিয়া) তিনি দখল করে মস্ত বড়ো ব্যাবিলোনিয়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। রাজা হামুরাবির কথা তোমাদের পরে বলব।

ব্যাবিলন এবং পরে আসিরীয়রাও সুমেরীয় লিপি গ্রহণ করেছিল।

সুমেরীয় সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করে পরে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে।

অনুশীলনী

১। কোন্ দেশটিকে মেসোপটেমিয়া বলা হয়? মেসোপটেমিয়া শব্দটির অর্থ কী? কারা নামটি দিয়েছিল? কেন দিয়েছিল?

২। মেসোপটেমিয়ার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্বন্ধে কী জান?

৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে সুমেরীয়রা কী কী করত?

৪। প্রাচীন সুমেরের জমিতে কোন্ কোন্ জিনিসের চাষ হোত? বাগানে কী কী ফল ফলত?

৫। সুমেরীয়রা কী কী কাজ জানত?

৬। সুমেরীয়দের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কী জান?

৭। সুমেরীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখ?

৮। সুমেরীয়দের লিপিকে কী লিপি বলা হয়? কেন বলা হয়?

৯। বন্ধনীর মধ্যে ঠিক উত্তরটি দেওয়া আছে। সেটি বেছে নিয়ে নীচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) বর্তমানে যে-দেশটির নাম —, প্রাচীনকালে তাকেই মেসোপটেমিয়া বলা হোত। (ইরান/ইরাক)

(খ) মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশের নাম —। (ব্যাবিলোনিয়া/আসিরিয়া)

(গ) — সভ্যতাই সবচেয়ে প্রাচীন। (মিশরের/সুমেরের)

(ঘ) সুমেরীয়রা ছিল খুবই —। (অলস/পরিশ্রমী)

(ঙ) উরের প্রধান নগরদেবতা ছিলেন —। (নান্নার/এয়া)

(চ) চাকাওয়ালা গাড়ি প্রথম ব্যবহার করতে শিখেছিল —। (সুমেরীয়রা/মিশরীয়রা)

১০। টাইগ্রাস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটি না থাকলে মেসোপটেমিয়ার কী অবস্থা হোত?

১১। সুমেরীয় পুরোহিতদের সম্বন্ধে কী জান?

১২। সুমেরীয় যোদ্ধারা কী রকম ছিল?

১৩। সুমেরের কয়েকটি নগরের নাম কর।

১৪। কয়েকজন সুমেরীয় দেবতার নাম কর।

১৫। সুমেরীয়রা কিসের ওপর লিখত? কী দিয়ে লিখত?

১৬। সুমেরীয়রা প্রথমে কার কাছে পরাজিত হয়েছিল?

১৭। সারগণ কে? তিনি কী করেছিলেন?

১৮। সুমের-আক্কাদ রাজ্যটির পতন হয়েছিল কী ভাবে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশর

এবার তোমাদের যে-দেশটির কথা বলব তার নাম মিশর। মেসোপটেমিয়ার মতোই সুদূর প্রাচীনকালে মিশরে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

অবস্থান: লোহিত সাগরকে পেছনে ফেলে সুয়েজ খাল দিয়ে এগিয়ে গেলেই পড়ে ভূমধ্যসাগর। সুয়েজ খাল যেখানে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পড়েছে, ঠিক তার বাঁ-দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি দেশ। এই দেশটির নামই মিশর। মিশরের দুদিকে সমুদ্র ; পুবে লোহিত

সাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। বাকি দুদিকে মরুভূমি। মিশরের দক্ষিণে বা পশ্চিমে যে-দিকেই তাকাও, দেখবে শুধু বালি আর

বালি। এদেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম, তেমনি সূর্যের তাপও খুব বেশি। নীলনদের জন্যই মরুভূমি মিশরকে গ্রাস করতে পারে নি।

নীলনদ : পৃথিবীতে যত বড়ো বড়ো নদী আছে, নীলনদ তাদের মধ্যে একটি, দৈর্ঘ্যে প্রায় চার হাজার মাইল। দক্ষিণের আবিসিনিয়ার পাহাড় থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে পড়েছে ভূমধ্যসাগরে। প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের বরফগলা জল নীলনদের দুই কূল ছাপিয়ে গোটা মিশরকে ভাসিয়ে দিয়ে যায়। বন্যার জল সরে গেলে নদীর দুই পাশের জমিতে পলিমাটির একটি পুরু আস্তরণ পড়ে। এই পলিমাটির গুণেই মিশরের জমিতে আজও সোনা ফলে। পলিমাটির অফুরন্ত উর্বরাশক্তি সেই সুদূর প্রাচীন কালেই মিশরকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করেছিল। তাই নীলনদকে 'মিশরের প্রাণ' বলা হয়। মোহানার কাছে নীলনদ কতকগুলো শাখায় ভাগ হয়ে যাওয়ায় সেখানে একটি ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলটির নাম নিম্ন বা উত্তর মিশর। এর দক্ষিণাংশকে বলা হয় উচ্চ বা দক্ষিণ মিশর।

ভূ-প্রকৃতি ও সেচ-ব্যবস্থা : মিশরে অসংখ্য জলাভূমি ছিল। তা ছাড়া, নীলনদে প্রতি বছর বন্যা হোত। সে বন্যার চেহারা ছিল ভয়ঙ্কর। মিশরীয়রা বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিল। তারা নীলনদের জায়গায় জায়গায় বাঁধ তৈরি করত। তারপর অসংখ্য খাল

মিশরীয়দের কৃষিকাজ
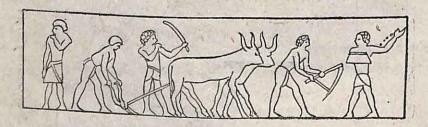
কেটে সেই বন্যার জল নিয়ে যেত চাষের জমিতে। চাষের জমিতে কূপ কেটে ঐ জল চাষীরা ধরে রাখত। ফলে চাষের জন্যে তাদের জলের কোন ভাবনা ছিল না। বালতির মতো দেখতে একরকম পাত্রের সঙ্গে দড়ি বেঁধে তারা জল তুলত এবং সেই জল জমিতে দিত।

একে শাডুফ বলা হয়। জলাভূমির জল সেচে ফেলে, নল-খাগড়ার জঙ্গল কেটে চাষীরা ফসলের জমি বাড়াত। কঠোর পরিশ্রম করেই মিশরের লোক ক্ষেতে ফসল ফলাত। সেখানে প্রচুর পরিমাণে গম ও বার্লির চাষ হোত। শুকনো জমিতে জন্মাত অসংখ্য খেজুর গাছ।

গ্রাম ও নগর : তোমাদের আগেই বলেছি যে, নীলনদ ছিল মিশরের প্রাণ। অর্থাৎ নীলনদের জলের ওপর মিশরবাসীদের জীবন নির্ভর করত। তাই, বিশেষ করে চাষের প্রয়োজনে অতি প্রাচীন-কালেই নীলনদের দুই পাড়ে ছোটো ছোটো গ্রাম গড়ে ওঠে। পরে মিশরীয়রা ধাতুর যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শেখে, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে শুরু করে। এ সময় থেকেই গ্রামগুলো ধীরে ধীরে নগরে পরিণত হয়। পৃথিবীতে প্রথম নগর গড়ে ওঠে সুমেরে, পরে মিশরে।

এ যুগে নীলনদের দুই তীর জুড়ে বেশ কয়েকটি ছোটোখাটো রাজ্য ছিল। এক রাজ্যের সঙ্গে আর এক রাজ্যের প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ হোত। কিছুকাল পরে মিশরের উত্তরে এবং দক্ষিণে দুই শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠে। এরও বেশ কিছুকাল পরে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে, উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক রাজার অধীনে আসে। এই রাজার নাম মেনেস। তিনি মিশরের বর্তমান রাজধানী কায়রোর কিছু দূরে একটি সুন্দর নগর নির্মাণ করেন। এর নাম মেম্ফিস। মেম্ফিস ছিল মেনেসের রাজধানী।

মিশরের প্রাচীন রাজবংশ : প্রাচীন মিশরে ত্রিশটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। মেনেসের কয়েকশো বছর পরে মিশর একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। প্রজারা তখন সুখে-শান্তিতে বাস করত। দেশে শিল্প-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। এ যুগের রাজাদের মধ্যে খুফু, খাপ্রে প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশরের ইতিহাসে প্রায় দু হাজার বছরের এই কালকে বলা হয় 'পিরামিডের কাল'।

মেনেসের কয়েকশো বছর পরে আরব দেশ থেকে হিকসস নামে একটি যাযাবর জাতি এসে মিশর জয় করে। যুদ্ধবিদ্যায় হিকসসরা মিশরীয়দের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তারা ঘোড়ায়-টানা রথে

চড়ে যুদ্ধ করত। কয়েকশো বছর ধরে হিকসসরা মিশরে রাজত্ব করে। ১৫৬৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মিশর-রাজ প্রথম আমোসে হিকসসদের তাড়িয়ে দিয়ে মিশরে একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় থেকেই মিশরের ইতিহাসে সাম্রাজ্য-যুগের শুরু হয়। পরে আবার এ বিষয়ে তোমাদের বলব।

ফারাওঃ মিশরীয়রা তাদের রাজাকে ফারাও বলত। 'ফারাও' শব্দটির অর্থ যিনি বড় বাড়িতে বাস করেন। প্রজারা 'ফারাও'কে দেবতার মতো ভক্তি করত, মেনে চলত। ফারা-ওদের মধ্যে খুফু, খাপ্রে, তৃতীয় থুথমোস, ইখ্‌নাটন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মিশরে ফারাও ছিলেন সর্বেসবা। তিনি ছিলেন রাজা ও দেবতা। দেশের সব জমিজমার মালিক ছিলেন তিনি। প্রজারা এবং অসংখ্য ক্রীতদাস তাঁর হয়ে যুদ্ধ করত, খাল কাটত, বাঁধ বাঁধত, ইমারত গড়ত।

ফারাও টুটেন খামেন

পুরোহিতঃ সম্মান, প্রতিপত্তি বা ক্ষমতার দিক দিয়ে মিশরে ফারাওদের পরেই ছিল পুরোহিতদের স্থান। ফারাও নিজেও তাঁদের যথেষ্ট সমীহ করে চলতেন। প্রজারা তাদের ফসলের একটি ভাগ পুরোহিতদের দিত। কাজেই পুরোহিতদের চাষের কাজ করতে হোত না। তাঁরা সব সময়ই লেখাপড়া নিয়ে থাকতেন, জ্ঞানের চর্চা করতেন। পুরোহিতরা ছাত্রদের লেখাপড়াও শেখাতেন। দেবমন্দিরের সঙ্গে একটি করে বিদ্যালয় থাকত। পুরোহিতরা ঋতুর পরিবর্তন, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান প্রভৃতি লক্ষ্য করতেন। আকাশে নক্ষত্রের অবস্থান লক্ষ্য করে তাঁরা বছর গণনা করতেও শিখেছিলেন। ফলে, সেই প্রাচীনকালেই মিশরে নানা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। পুরোহিতরাই প্রথম লিপির ব্যবহার করেন।

মিশরের লিপি ও লিপিকরঃ মিশরে খালবিল ও নদীনালার ধারে প্রচুর প্যাপিরাস গাছ জন্মাত। এই প্যারিসের ডাঁটা থেকে

মিশরের লোক একরকমের জিনিস তৈরি করত। তার ওপর তারা লিখত। মিশরের লিপিকে বলা হয় চিত্রলিপি বা হাইরোগ্লিফিক। আসলে এগুলো হচ্ছে নানা রকমের ছবি। মিশরীয়রা প্রথম দিকে ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করত। পরে এইসব ছবি থেকে অক্ষরের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া, মিশরের সমাধিমন্দিরগুলোর গায়ে এবং পাথরের ফলকেও বহু লেখা খোদাই করে রাখা হোত। ফরাসী পণ্ডিত শ্যাপোলিয়ঁ বহু চেষ্টা করে এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছিলেন। তার পর থেকেই মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা জানা গেছে।

মিশরের এই চিত্রলিপি ব্যবহার করতে জানত বিশেষ এক শ্রেণীর লোক। তাদের লিপিকর বলা হোত। সমাধি-মন্দিরের গায়ে, ফলকে ও সীলমোহরে এবং প্যাপিরাসের ওপর লেখার জন্য বহু লিপিকরের দরকার হোত। রাজকোষ থেকে এদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হোত।
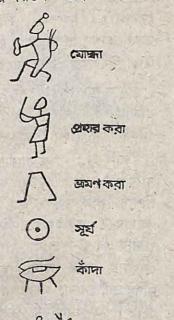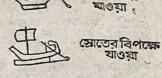
মিশরের হাইরোগ্লিফিক
(বা চিত্রলিপি)

রাজস্ব সংগ্রাহক ও সৈনিক : রাজকোষ দেখাশোনার ভার ছিল দুইজন কর্মচারীর ওপর। এঁরা রাজস্ব ধার্য করতেন এবং রাজস্ব আদায় করারও সব ব্যবস্থা করতেন। রাজস্ব আদায়ের জন্যে বহু কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। তখনও টাকা-পয়সার প্রচলন ছিল না। কাজেই নানা রকমের ফসল, তেল, চামড়া প্রভৃতি রাজস্ব বা খাজনা বাবদ রাজকোষে জমা হোত।

ফারাও-এর স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল। পদাতিক সৈন্যের সংখ্যাই ছিল বেশি। যুদ্ধের সময় জোর করে কৃষকদের ধরে এনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হোত। সেনাদলকে কয়েকটি ভাগে

ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতি ৫০০০ সৈনিকের ওপর একজন সেনাপতি থাকতেন। মিশরীয়রা হিকসসদের কাছ থেকে যুদ্ধের নতুন কৌশল শিখেছিল। ঘোড়ায়-টানা রথে চড়ে যুদ্ধ করতে শিখেছিল তারা হিকসসদের কাছ থেকেই।

যুদ্ধে সাধারণতঃ বর্শা, ঢাল, কুঠার প্রভৃতি ব্যবহার করা হোত। রাজার একটি নৌবাহিনীও ছিল। ফারাও ৩য় রামেশিসের রাজত্বকালে মিশরীয় নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করেছিল।

বাণিজ্য ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যে মিশরীয়রা বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করত না। মিশরে প্রচুর ফসল ফলত। মিশরে পাথরের অভাব ছিল না। কিন্তু রাজা বা দেবমন্দিরের প্রয়োজনে কতকগুলো জিনিস বিদেশ থেকে আনতেই হোত। সিনাই-এর খনি থেকে আনা হোত প্রচুর তামা আর নীলকান্ত মণি। লেবানন থেকে আনা হোত সীডার কাঠ ও রজন। ম্যালাকাইট, মণিমুক্তো, সোনা, মসলাপাতি, দামী পাথর প্রভৃতিও আমদানি করা হোত। এসব জিনিস নিয়ে আসার জন্যে ফারাও রাজকোষ থেকে অর্থ দিয়ে বাণিজ্যদল পাঠাতেন বিদেশে। এইসব বাণিজ্যদলের সঙ্গে একটি সেনাদলও থাকত। সেনাদলের কাজ ছিল বাণিজ্যদলটিকে পাহারা দেওয়া। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মিশরে বাণিজ্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং ফারাও বা রাজা। মেসোপটেমিয়ার মতো বেসরকারী উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য মিশরে একরকম ছিল না বললেই হয়।

পিরামিড ঃ পৃথিবীর আশ্চর্য জিনিসগুলোর মধ্যে মিশরের পিরামিড একটি; মিশরকে বলা হয় পিরামিডের দেশ। সারা মিশরে এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে মস্ত উঁচু সব পাথরে তৈরি ত্রিকোণাকার পিরামিড। পিরামিড আসলে সমাধিমন্দির। মিশরের রাজা বা রাজবংশের কেউ যখন মারা যেতেন, তখন সেই মৃত-দেহকে কবর দিয়ে রাখা হোত পিরামিডের ভেতরে। মিশরে প্রথম পিরামিডটি তৈরি করিয়েছিলেন ফারাও দোসের। এটির নির্মাতা ইম্‌হোতেপ মিশরবাসীদের কাছে আজও অমর হয়ে আছেন। মিশরের সবচেয়ে বড়ো পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর সমাধি-মন্দির।

এই পিরামিড ৪৮১ ফুট উঁচু। এক লক্ষ লোক দীর্ঘ বিশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে এই পিরামিডটি গড়ে তুলেছিল। কায়রোর
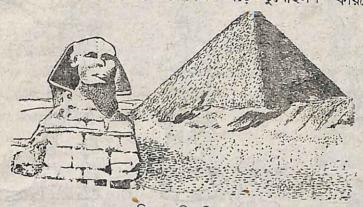
মিশরের পিরামিড

কাছে গিজে নামে একটি জায়গায় প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার এই পিরামিডটি আজও দাঁড়িয়ে আছে।

পিরামিডের মধ্যে মৃত রাজার সঙ্গে নানারকমের মূল্যবান আসবাবপত্র, মণিমুক্তো, প্রচুর খাদ্য ও পানীয়, এমন কি দাসদাসী পর্যন্ত সমাধিস্থ করা হোত। পিরামিডের ভেতরটা ছিল একেবারে রাজপ্রাসাদের মতোই। সেখানে দরবার-ঘর থেকে শুরু করে কি না ছিল।

ধর্মবিশ্বাস : মিশরের লোক বিশ্বাস করত যে, মৃত্যুর পরেও মানুষের জীবনের শেষ হয় না। তাই কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহকে যত্ন করে তারা রেখে দিত। একখণ্ড মিহি কাপড়ে অনেকগুলো ভাঁজে জড়িয়ে এক ধরনের আরক মাখিয়ে মৃতদেহটিকে ম্যমি করে রাখা হোত।

দেবদেবী : মিশরীয়রা বহু দেবদেবীর পুজো করত। রা, ওসিরিস, হোরাস, আইসিস প্রভৃতি ছিলেন শক্তিশালী দেবদেবী। রা ছিনেন সূর্যদেবতা। থিবস্ নগরে এরই নাম ছিল আমন। এ ছাড়া, তারা বেড়াল, কুমীর প্রভৃতি জীবজন্তুরও পুজো করত।

প্রধান প্রধান জীবিকা : প্রাচীনকালে মিশরীয় সভ্যতা যে

খুবই উন্নত ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফারাওরা

আইসিস ওসিরিস হোরাস

পিরামিড ছাড়াও বিশাল বিশাল দেবমন্দির, স্তম্ভ প্রভৃতি তৈরি

মিশরীয় কুমোর

করিয়েছিলেন। মিশরীয়রা ইট গেঁথে দালান তৈরি করত। স্থপতি,

মিশরের ইটখোলা

ভাস্কর, কামার, কুমোর, তাঁতী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কারিগর এসব নির্মাণকার্য করত। মিশরীয়রা পাথর কেটে কেটে সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়ত। মিশরে প্রচুর তূলার চাষ হোত। সেই তূলা থেকে সুতো কেটে তারা মিহি কাপড় বুনত। মাটি, কাচ, সোনা ও তামা থেকে তারা বাসনকোসন ও অলঙ্কার তৈরি করত। চামড়া ও সুতো বোনার কাজে তারা বিশেষ পটু ছিল। পাথর এবং কাঠের ওপর খোদাই করার কাজেও মিশরীয়রা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মিশরীয়রা সুন্দর সুন্দর জাহাজও নির্মাণ করেছিল।

অনুশীলনী

(ক) মিশর দেশটি কোথায়? মিশরের ভূ-প্রকৃতি সম্বন্ধে কী জান?

(খ) মিশরের কোন্ কোন্ অংশকে নিম্ন মিশর এবং উচ্চ মিশর বলা হয়?

(গ) নীলনদ না থাকলে মিশরের অবস্থা কী হোত এবং কেন হোত?

(ঘ) মিশরের ওপর দিয়ে নীলনদ বয়ে যাওয়ার ফলে মিশরের কী কী লাভ হয়েছে?

(ঙ) মিশরীয়রা বন্যার জল কী ভাবে কাজে লাগাত?

(চ) প্রাচীন মিশরের সেচ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কী জান?

(ছ) মিশরে কোন্ সময় থেকে নগর গড়ে ওঠে?

(জ) কোন্ সময় উত্তর ও দক্ষিণ মিশর এক রাজার অধীনে আসে? সেই রাজার নাম কী?

২। (ক) মেনেস কে? তাঁর রাজধানীর নাম কী?

(খ) হিকসস্ বলতে কাদের বোঝায়? মিশরে তারা কতদিন রাজত্ব করেছিল?

(গ) 'ফারাও' কাকে বলা হোত? কথাটির অর্থ কী?

(ঘ) মিশরীয় পুরোহিতদের সম্বন্ধে কী জান?

(ঙ) 'হাইরোগ্লিফিক' কী? 'প্যাপিরাস' কী?

৩। বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) মিশরয়ীরা যুদ্ধরথ ব্যবহার করতে শিখেছিল—কাছ থেকে। (আসিরীয়দের/হিকসস্দের)

(খ) মিশরে পাথরের খুব অভাব—। (ছিল/ছিল না)

(গ) —পিরামিডের দেশ বলা হয়। (মিশরকে/মেসোপটেমিয়াকে)

(ঘ) মিশরের সবচেয়ে বড়ো পিরামিডটি তৈরি করেছিলেন—। (খাপ্রে/খুফু)

(ঙ) —ছিলেন সূর্যদেবতা। (হোরাস/রা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিন্ধু উপত্যকা

সভ্যতার প্রাচীনতম দুটি কেন্দ্র মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের কথা তোমাদের বলেছি। এবার তোমাদের বলব পশ্চিম ভারতের সিন্ধু উপত্যকার কথা। মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের মতো এখানেও সুদূর প্রাচীনকালে একটি উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

অবস্থান : আয়তনের দিক থেকে সিন্ধু উপত্যকাটি ছিল মেসোপটেমিয়া বা মিশর থেকে অনেক বড়ো। সিন্ধু নদের মোহানা থেকে পঞ্চনদের সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটি জুড়ে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নামে দুটি শহরের ধ্বংসাবশেষ মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায়। এই ধ্বংসাবশেষ থেকেই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে এই অঞ্চলে একটি

সিন্ধু উপত্যকা
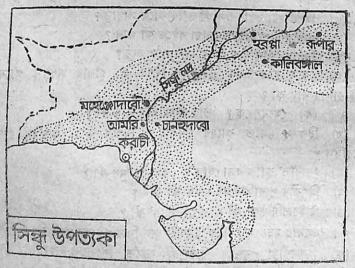
উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। হরপ্পা শহরটি পাঞ্জাবে, সিন্ধুনদের একটি শাখা ইরাবতীর তীরে। জায়গাটি বর্তমানকালের লাহোর থেকে প্রায় একশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। মহেঞ্জোদারো সিন্ধুনদের তীরে, পাকিস্তানের করাচী থেকে প্রায় ২০০ মাইল উত্তরে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মধ্যে দূরত্ব প্রায় চারশো মাইল। তবুও নগর দুটির মধ্যে

নানা দিক থেকে মিল আছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, নগর দুটি ছিল একই রাজ্যের দুটি রাজধানী, হরপ্পা উত্তরাঞ্চলের ও মহেঞ্জোদারো দক্ষিণাঞ্চলের।

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার: হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে যে-সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে, তাকেই বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা। এই সভ্যতা আবিষ্কারের জন্যে বাঙ্গালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তখনকার অধিকর্তা জন মার্শালের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে মাটি খুঁড়ে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। 'মহেঞ্জোদারো' কথাটির অর্থ 'মড়ার ঢিবি'। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া জিনিসপত্রের আশ্চর্য মিল রয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোতে মাটি খুঁড়ে যেসব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে নানা আকারের কতকগুলো সীলমোহর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সীলমোহরগুলোতে জীবজন্তু ও বৃক্ষদেবতার ছবি আছে। আর আছে একরকম চিত্রলিপি যার পাঠ আজও পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। এখানে সোনা, রূপা ও নানা রকম মূল্যবান ধাতুর অলঙ্কার এবং পদ্মরাগমণি, নীলকান্তমণি প্রভৃতি মূল্যবান পাথর পাওয়া গেছে। অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে কুড়ুল, ছোরা, তীর-ধনুক, গদা প্রভৃতি। এ ছাড়া, পাওয়া গেছে নানা রকম কারুকার্য-করা মাটির বাসনকোসন ও খেলনা। সিন্ধু উপত্যকার লোক পুঁতির গায়ে জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি ফুটিয়ে তুলত। এরকম বহু পুঁতি পাওয়া গেছে।

সীলমোহর

নারীমূর্তি

মহেঞ্জোদারোর রঙীন মাটির পাত্র

জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি দিয়ে বাচ্চাদের খেলনাও তৈরি হোত। আর পাওয়া গেছে মাটির তৈরি অজস্র নারীমূর্তি এবং তিনমুখবিশিষ্ট কয়েকটি শিবমূর্তি। হরপ্পায় শিবলিঙ্গের মতো কতকগুলো পাথরও পাওয়া গেছে।

হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো ছাড়াও আশেপাশের কতকগুলো ঢিপি খুঁড়েও গ্রাম-বসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। এরকম ঢিবি খোঁড়া হয়েছে বোলান গিরিপথের কয়েকটি জায়গায়, সিন্ধু প্রদেশের আমরিতে বেলুচিস্তানের নাল নদীর উপত্যকায়, দক্ষিণ বেলুচিস্তানের কুল্লিতে, মাশ্‌কাই নদীর উপত্যকা মেহিতে এবং কেজ্‌ নদীর উপত্যকা শাহী টুম্পে। এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ মাটির পাত্র তৈরি করে পুড়িয়ে নিত, সাধারণতঃ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত; তবে, অল্পবিস্তর তামার ব্যবহার জানত। এরা পাথর বা কাদামাটি দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করত।

নগর পরিকল্পনা : মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের লোক তখন নগরে বাস করতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। দুটি নগরই রীতিমতো পরিকল্পনা করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর এই দুই নগরের পাশে গড়ে উঠেছিল বেশ কয়েকটি আধা-শহর। ইরাবতী নদীটি হচ্ছে সিন্ধু নদেরই একটি শাখা। এই ইরাবতী নদীর তীরেই প্রাচীনকালে হরপ্পা নগরটি গড়ে ওঠে। পণ্ডিতদের ধারণা যে, ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ইরাবতী নদীতে খুব বন্যা হোত। সেই বন্যার হাত থেকে হরপ্পাকে বাঁচাবার জন্যে নগরের পশ্চিম দিকে একটি বড়ো বাঁধ তৈরি করা হয়। সেটিকে দেখতে অনেকটা দুর্গপ্রাকারের মতো। মহেঞ্জোদারোর পশ্চিম দিকেও ঠিক এমনি একটি বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাচীনকালে মহেঞ্জোদারো নগরটি সিন্ধু নদের প্লাবনে কয়েকবার ডুবে গিয়েছিল।

হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর রাস্তাঘাট ও ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল একই রকমের পরিকল্পনা অনুসারে। রাজপথগুলো টানা-টানা ও সিধে এবং বেশ চওড়া। দুটি নগরই কয়েকটি এলাকাতে ভাগ করা হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোও এরকম কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত ছিল।

এখনকার গ্রাম বা শহরে যেমন পাড়া, এ যেন ঠিক তাই। শহর দুটিতে চওড়া রাস্তা তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল অনেক অলিগলি।

দুটি নগরের কোথাও পাথরের বাড়ি পাওয়া যায় নি, সবগুলো বাড়িই পোড়া ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি বাড়ি, বাড়িগুলোর কোনোটাই এলোমেলো ও খাপছাড়া নয়। প্রত্যেক বাড়ির সামনের দিকে একটি চৌকোণা উঠোন আর উঠোন পেরোলেই চারদিক ঘিরে কয়েকটি কোঠা। বাড়িতে ঢোকার পথটি সদর রাস্তা দিয়ে নয়, পাশের গলি দিয়ে। কোঠাগুলোর কোনোটাতেই রাস্তার দিকে জানালা নেই। দেওয়ালের ভেতর দিকটা মাটি দিয়ে লেপা। বাড়িগুলো শুধু একতলাই নয়, দোতলা, তেতলা, হয়তো আরও উঁচু ছিল। প্রত্যেক বাড়িতেই ছাদে ওঠার সিঁড়ি আছে।

সব বাড়িতেই রান্নার ঘর, স্নানের ঘর, বসার ঘর প্রভৃতির আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। স্নানঘর থেকে ময়লা জল বাইরে রাস্তার নর্দমায় গিয়ে যাতে পড়ে, তার জন্যে স্নানঘরে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার বড় বড় নর্দমা দিয়ে শহরের ময়লা জল বেরিয়ে যেত। এই নর্দমা-গুলো ছিল ঢাকা, তবে মাঝে মাঝে ইটে গাঁথা ম্যানহোল আছে। নর্দমাগুলো নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করার জন্যে কি সুন্দর ব্যবস্থা! প্রত্যেক বাড়ির দেওয়ালে ইট দিয়ে ডাস্টবিন গেঁথে তোলা হোত। বাড়ির মধ্যেও কেউ যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলত না, সব জড়ো করত বাড়ির ডাস্টবিনে। আজকের দিনেও ক'টা শহরে আমরা এটা দেখি? হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে বোঝা যায়, একটি সুন্দর পরিকল্পনা-অনুযায়ী শহর দু'টিকে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর এই নগর পরিকল্পনা করেছিল বর্তমান কালের করপোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির মতো কোনো পৌরসংস্থা। তা ছাড়া, এমন সাজানো-গোছানো শহর কোনোমতেই গড়ে উঠতে পারে না।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে বড়ো, মাঝারি, ছোটো প্রভৃতি নানা মাপের বাড়ি তৈরি হয়েছিল। মনে হয়, বড়ো মাপের বাড়িগুলোতে ধনীরা বাস করত, মাঝারি মাপের বাড়িতে মধ্যবিত্তেরা। দুই কামরার ছোটো ছোটো কুঠুরিতে থাকত গরীবশ্রেণীর লোক।

নগরবাসীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কুয়ো কেটে।

কুয়োর পাড় ইট দিয়ে বাঁধানো। কয়েকটি কুয়োর পাশে অসংখ্য খুরি ছড়ানো। মনে হয়, খুরিতে জল খেয়ে পরে সেটাকে ফেলে দেয়া হোত।

মহেঞ্জোদারোতে মস্ত বড়ো একটি স্নানাগার তৈরি করা হয়েছিল।
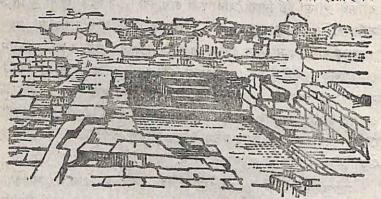
মহেঞ্জোদারোর বৃহৎ স্নানাগার

স্নানাগারটি দেখতে অনেকটা চৌবাচ্চার মতো। লম্বায় ৪০ ফুট,

রাস্তা ও রাস্তার নীচের পয়ঃপ্রণালী (মহেঞ্জোদারো)

চওড়ায় ২৪ ফুট এবং ৮ ফুট গভীর। চৌবাচ্চাটির ভেতর দিকে চারপাশ ইট দিয়ে সুন্দর করে বাঁধানো। জল যাতে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে এই ব্যবস্থা। এক কোণে একটি ফুটোর সাহায্যে জল বের করে দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। চৌবাচ্চাটিকে ঘিরে সারি সারি কামরা ছিল। অনেকের মতে, এসব কামরায় পুরোহিতরা থাকতেন। মহেঞ্জোদারোর লোক চৌবাচ্চার জলকে পবিত্র বলে মনে করত।

মহেঞ্জোদারোতে একটি মস্ত বড় দালানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। দালানটি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। অনেকের মতে, এটি ছিল রাজপ্রাসাদ। আবার দালানটি কতকগুলো কামরায় ভাগ করা বলে অনেকের মতে এটা একটা আশ্রম।

হরপ্পায় মস্ত বড়ো একটি শস্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছিল। নগরটি মাঝে মাঝে বন্যার কবলে পড়ত। তাই ইট গেঁথে গেঁথে উঁচু একটি ভিত তৈরি করে তার ওপরে এই শস্যাগারটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

শস্যাগারের কাছেই ছিল শস্য পেষাই করার জন্যে ইটে-গাঁথা গোল গোল চত্বর, আর এক দিকে কামারশালা। শহর দুটির পরিকল্পনা দেখেই বোঝা যায় যে, তখন সিন্ধু উপত্যকায় একটা সমৃদ্ধির যুগ চলছিল। অধিবাসীরা চাষবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের অর্থ-নৈতিক অবস্থাকে উন্নত করে তুলেছিল।

খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য ঃ সেকালের সিন্ধু উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সিন্ধুনদের প্লাবন হোত। প্লাবনের জল সরে গেলেই জমির ওপরে পলিমাটি জমত। ফলে জমিতে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতোই প্রচুর ফলন হোত। খাদ্যশস্যের মধ্যে ছিল গম, বার্লি, ধান, তিল, মটর ও নানা রকমের শাকসব্জি। অধিবাসীরা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি খেত। ফলের মধ্যে খেজুর ও তরমুজই ছিল প্রধান। সিন্ধু উপত্যকার প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল ষাঁড়, মহিষ, শূয়োর, ভেড়া, কুকুর, বেড়াল, গাধা, হাতি প্রভৃতি। হরপ্পাতেই প্রথম মুরগী পালন হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর স্ত্রীলোকেরা খুবই সৌখিন

ছিল। তারা চুলে খোঁপা বাঁধত; কানে, গলায় ও হাতে নানা রকম অলঙ্কার পরত। পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা খাটো পোশাক পরত। পুরুষরাও অলঙ্কার পরত এবং মেয়েদের মতো লম্বা চুল রাখত। পুরুষদের অলঙ্কারের মধ্যে ছিল হার, আংটি ও বাজুবন্ধ। সোনা,
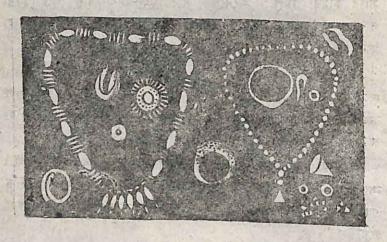
অলঙ্কার

রূপা, মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত ও ঝিনুক প্রভৃতি দিয়ে জহুরীরা অলঙ্কার তৈরি করত। সোনা, রূপা প্রভৃতি দিয়ে হরপ্পার লোক একরকম পুঁতি তৈরি করত। পুঁতিগুলোর গায়ে জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকা হোত। সিন্ধু উপত্যকার লোক প্রসাধন-সামগ্রীও ব্যবহার করত। মেহির কবরখানা থেকে ব্রোঞ্জের তৈরি ডিম্বাকৃতি আয়না ও হাতির দাঁতের তৈরি নানা আকারের চিরুনি পাওয়া গেছে।

আসাবাবপত্রের মধ্যে কাঠের চেয়ার, চৌকি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে নানারকমের পাত্র, কোনোটা মাটির তৈরি, কোনোটা তামা বা ব্রোঞ্জের। তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের পাশাপাশি পাথরের হাতিয়ারও পাওয়া গেছে। তামা, ব্রোঞ্জ ও হাতির দাঁতের তৈরি সূচ ও তুরপুনও পাওয়া গেছে।

শিল্পঃ সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর তূলার চাষ হোত। অধিবাসীরা তূলা থেকে কাপড় বুনত। সুতোর কাপড় বোনার কাজে তারা যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। কাপড়ে রং করতেও তারা জানত।

সিন্ধু উপত্যকার কুমোর চাকের সাহায্যে নানা রকম মাটির বাসন-কোসন ও পাত্র তৈরি করত। পাত্রগুলোর ওপরে জীবজন্তুর ছবি আঁকা হোত। হরপ্পা রাজ্য থেকে দু'হাজারেরও বেশি সীলমোহর পাওয়া গেছে। চৌকোণা নরম পাথরের ওপর ছবি ও লেখা খোদাই করে সীলমোহরগুলো তৈরি করা হোত। বণিকরা এসব সীলমোহর ব্যবহার করত। সুতরাং পাথর থেকে সীলমোহর তৈরি করার কাজেও একদল মানুষ নিযুক্ত থাকত।

ছুতোরের কাজের নমুনাও মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে, যেমন, কাঠের আসবাবপত্র। দুই চাকার গোরুর গাড়ি ছিল স্থলপথের যানবাহন। হরপ্পায় যে-করাত তৈরি হোত, তা ছিল সকলের সেরা।

ধাতুর কারিগরেরা তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা রকম জিনিস তৈরি করত। ব্রোঞ্জের কাজ জানত বলেই সুমেরের থেকে সিন্ধু সভ্যতাকে আরও উন্নত বলে মনে করা হয়। সিন্ধু উপত্যকার কারিগর সীসার ব্যবহারও জানত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নানাবিধ শিল্পের কাজেও সিন্ধু উপত্যকাবাসীরা দক্ষতা অর্জন করেছিল। তবে মাটির বা ধাতুর পাত্রের নির্মাণ-কৌশল, সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সুমেরের শিল্পীদের মান ছিল উঁচু।

বাণিজ্য : সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে লেনদেন করত, আবার দূর দূর দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। একদিকে যেমন কৃষি, অপরদিকে তেমনি বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশে সমৃদ্ধি এসেছিল। সিন্ধু উপত্যকায় ঝিনুক ও কয়েক শ্রেণীর পাথর আসত কাথিয়াবাড় ও দাক্ষিণাত্য থেকে ; রূপা, নীলকান্তমণি প্রভৃতি আসত পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে ; আর তামা আসত রাজস্থান বা পারস্য থেকে। হয় তিব্বত, নয় মধ্য এশিয়া থেকে আসত জেড্ পাথর। সুমের, এলাম, মিশর, ক্রীট প্রভৃতি দূর দূর দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সিন্ধু উপত্যকায় যে-সুতোর কাপড় তৈরি হোত, তা যেত দেশ-বিদেশে, বিশেষ করে মেসোপটেমিয়ায়।

দেবদেবী ও ধর্মবিশ্বাস : হরপ্পা বা মহেঞ্জোদারোর কোথাও মন্দির পাওয়া যায় নি। তবে পশুপতি বা শিব এবং মাতৃকাদেবীর

মতো বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। ফসল ফলাবার জন্যে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠানের নিদর্শন সীলমোহরগুলোতে পাওয়া গেছে। কয়েকটি সীলমোহরের ছবি থেকে দেখা যায় যেন ষাঁড়কে উপাসনা করা হচ্ছে। হিন্দু ধর্মে ষাঁড় শিবের বাহন। হরপ্পার লোক বৃক্ষদেবতার ও আগুনের পুজোও করত।

মহেঞ্জোদারোর শিবমূর্তি

মৃতদেহকে কবর দেবার প্রথা ছিল। এ ব্যাপারে মিশরীয়দের বিশ্বাসের সঙ্গে অনেকটা মিল দেখা যায়। হরপ্পায় কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির গয়নাগাঁটি, প্রসাধনের সরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি রেখে দেওয়া হোত।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী : সিন্ধু উপত্যকার মানুষের লিখিত ইতিহাস বলতে বোঝায় সীলমোহরের চিত্রলিপি। এ ছাড়া, সে যুগের আর কোনো লিখিত দলিল নেই। ফলে তখনকার সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ছিল কিনা, এ বিষয়ে কোনোও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা চলে।

পণ্ডিতদের ধারণা, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে চার শ্রেণীর লোক বাস করত। পুরোহিত, চিকিৎসক এবং জ্যোতির্বিদরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ওপরের তলায়। এদের নিচেই ছিল দ্বিতীয় শ্রেণী, যাদের পেশা ছিল যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্র চালনা করা। বণিক, তাঁতী, ছুতোর, কামার, কুমোর, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি নিয়ে ছিল তৃতীয় শ্রেণী। আর সকলের তলায় ছিল অসংখ্য মানুষ। চাষী, মজুর, জেলে, চাকর-বাকর, এরা সব ছিল চতুর্থ শ্রেণীর লোক। চামড়া দিয়ে যারা নানা রকম জিনিস তৈরি করত, তাদেরও এই শ্রেণীতে ফেলা যায়।

সীলমোহরের চিত্রলিপিগুলো কাদের রচনা? লেখাপড়া-জানা লোক ছাড়া একাজ করা সম্ভব নয়। সম্ভবত পুরোহিতরাই একাজ

করতেন; তাঁরা রাজকার্যেও অংশগ্রহণ করতেন। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর দুর্গপ্রাকারের ওপর ছোটো ছোটো কামরাগুলো কি উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল? ওখান থেকে কি নগরকে পাহারা দেওয়া হোত? কারা দিত? ভারী ভারী তরবারি আর গদা কারা ব্যবহার করত? অনুমান করা হয় যে, সৈনিক বা যোদ্ধারা নগর প্রহরার কার্যে নিযুক্ত থাকত। পরবর্তী কালের বৈদিক সমাজে ক্ষত্রিয় বা রাজন্যদের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়। এদের নিয়েই ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীটি। অসংখ্য মাটির পাত্র ও ক্ষুদে ক্ষুদে নারীমূর্তি, গোরুর গাড়ির চাকা, চৌকি আর আসবাবপত্র, তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার, সীলমোহর প্রভৃতি তৈরির কাজে জনসংখ্যার একটা মোটা অংশই নিযুক্ত ছিল। এরাই ছিল সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর লোক। বৈদিক যুগের বৈশ্যদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য আছে। আর সকলের তলায় ছিল খেটে-খাওয়া গরীব মানুষ।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(ক) সিন্ধু উপত্যকা বলতে কোন্ জায়গাটিকে বোঝায়?

(খ) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো কোথায় অবস্থিত?

(গ) সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার করেছিলেন কে বা কারা?

(ঘ) হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো থেকে কী কী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে?

(ঙ) মহেঞ্জোদারোর নগর-পরিকল্পনা সম্বন্ধে কী জান?

(চ) সিন্ধু উপত্যকায় কী কী চাষ হোত?

(ছ) সিন্ধু উপত্যকার লোক কী কী খেত?

(জ) সিন্ধু উপত্যকার কারিগররা কোন্ কোন্ জিনিস তৈরি করত?

(ঝ) সিন্ধু উপত্যকাবাসীদের দেবদেবী সম্বন্ধে কী জান?

(ঝ) সিন্ধু উপত্যকার লোক কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত?

(ট) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ক'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? কী কী শ্রেণী?

6

২। শুদ্ধ করে লেখ :

(ক) আয়তনের দিক থেকে সিন্ধু উপত্যকাটি ছিল মিশর থেকে অনেক ছোটো।

(খ) মহেঞ্জোদারো নগরটি ছিল ইরাবতী নদীর তীরে।

(গ) সিন্ধু উপত্যকায় সীলমোহর দালানকোঠার ছবি আছে।

(ঘ) সিন্ধু সভ্যতার জন্ম হয়েছিল ৩০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে।

(ঙ) হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর রাস্তাঘাটগুলো ছিল সরু সরু।

(চ) মহেঞ্জোদারো নগরটিতে গরীবের বাস ছিল না।

(ছ) সিন্ধু উপত্যকার লোক অলঙ্কার পরত না।

(জ) সিন্ধু উপত্যকার লোক ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত না।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) সিন্ধু উপত্যকার লোক — ওপরে জন্তু-জানোয়ারের ছবি ফুটিয়ে তুলত। (হাতিয়ারের/পুঁতির)

(খ) সিন্ধু উপত্যকা থেকে যে-জিনিসটি সবচেয়ে বেশি বিদেশে রপ্তানি হোত তা হোল —। (খেলনা/সুতোর কাপড়)

(গ) প্রথম মুরগী-পালন শুরু হয় —। (মিশরে/সিন্ধু উপত্যকায়)

(ঘ) সিন্ধু উপত্যকায় স্থলপথের যানবাহন ছিল —। (গোরুর গাড়ি/ ঘোড়ার গাড়ি)

(ঙ) ব্রোঞ্জের ব্যবহার আগে হয়েছে —। (মেসোপটেমিয়ার/সিন্ধু উপত্যকায়)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীন

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপত্যকা ঃ এবার তোমাদের প্রাচীন সভ্যতার আর একটি কেন্দ্র চীনের কথা বলব। চীন একটি বিশাল দেশ। সভ্যতার আর তিনটি কেন্দ্রের মতো এখানেও সভ্যতার জন্ম হয়েছিল বড় নদীর কূলে। চীনে দুটি নদী হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং খুবই বড়। এই দুই নদীর উপত্যকায় আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে নগরের উদ্ভব হয়।

আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগেই চীনে মানুষ বাস করত। চীনের চাউ-কাউ-তিয়েন গ্রামে আদিম মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এদের বলা হয় পিকিং-মানুষ। এদের আবির্ভাব হয়েছিল পুরনো পাথর-যুগে। আবার উত্তর চীনের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নতুন পাথর-যুগের বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। ব্রোঞ্জ যুগে এখানেই নগর গড়ে উঠেছিল। তবে সুমেরীয় বা মিশরীয় অথবা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার মতো চীনের সভ্যতা অত পুরনো নয়।

হোয়াংহো নদীতে ভয়ঙ্কর বন্যা হোত। প্রচুর বর্ষণের পরে বৃষ্টির জল নদীর দুটি কূল ছাপিয়ে আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দিত। এতে মানুষের কত যে ক্ষতি হোত, তা বলে শেষ করা যায় না। বন্যার জলে মানুষের ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, গরুবাছুর সবই ভেসে যেত। বন্যার পরে হোয়াংহো কখনও কখনও গতি পরিবর্তন করে নতুন খাতে বইতে শুরু করত। নদীর এই খামখেয়ালীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারা কি সহজ কথা! হোয়াংহো নদী তাই চীনাদের অশেষ দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকেই চীনারা কিন্তু বন্যা রোধ করার জন্যে নানা চেষ্টা করেছে। সভ্যতার আর তিনটি কেন্দ্রের মতো চীনের মানুষও জঙ্গল কেটে সাফ করে, বাঁধ বেঁধে, খাল কেটে বন্যার জলকে চাষের কাজে লাগিয়েছিল। চীনে বন্যা রোধের কাজে সফল হয়ে 'উ' খুবই

জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। চীনারা বলে, "উ না থাকলে আমরা মাছ হয়ে ঘুরতাম।" 'উ' হোয়াংহো নদীতে বাঁধ তৈরি করে বন্যার কবল থেকে তাঁর দেশকে বাঁচিয়েছিলেন। এজন্যে নানা পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে তাঁর কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে।

চীনের প্রাচীন ইতিহাস : ভারতের মতো চীনেও প্রাচীন যুগে ইতিহাস লেখার রেওয়াজ ছিল না। কাজেই চীনের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সেখানে প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয়েছে অনেক পরে। ফলে, প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে অনেক আজগুবি কাহিনীও স্থান পেয়েছে। চীনের আদি মানুষ পান-কুর কাহিনীটিও এমনিতরো আজগুবি। পান-কু আঠারো হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তিনিই নাকি পৃথিবী, বায়ু, মেঘ, বজ্র, নদী, মানুষ প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন।

পান-কুর পরে ফুসি, শেন-নুঙ্, হুয়াং-তি, ইয়া-ও এবং সুন্ নামে পাঁচজন সাধু রাজা পর পর চীনে রাজত্ব করেন। চীনাদের মাছ ধরা, রেশমের কাপড় বোনা, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, লেখাপড়া শেখা প্রভৃতি শিখিয়েছিলেন ফুসি। লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি করতে শিখিয়েছিলেন রাজা শেন-নুঙ। চীনারা গোরুর গাড়ি আর চুম্বকের ব্যবহার শিখেছিল হুয়াংতির কাছ থেকে। প্রথম ইটের দালান ও মানমন্দির তৈরি হয়েছিল তাঁরই আমলে। চতুর্থ রাজা ইয়া-ও ছিলেন খুবই ধার্মিক। পঞ্চম রাজা সুন্ তাঁরই এক যোগ্য কর্মচারীকে রাজপদে মনোনীত করলেন। এঁর নাম 'উ'। ইনি সিয়া নামে একটি নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আসলে সিয়া (সভ্য) হোল চীনের প্রথম রাজবংশ।

রাজা 'উ'-এর কথা ছড়িয়ে আছে চীনের বহু পৌরাণিক কাহিনীতে। হোয়াংহো নদীতে বাঁধ বেঁধে তিনি তাঁর দেশবাসীকে অশেষ দুঃখকষ্টের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা তিনি কয়েকটি পাহাড় কেটে হ্রদ নির্মাণ করেন। বন্যার জল তারপর থেকে হ্রদে এসে আট্‌কা পড়ে যেত, মানুষের ক্ষতি করতে আর পারত না। চীনের মানুষ এজন্যে আজও 'উ'-কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। 'উ'-এর পর থেকেই রাজপদ বংশানুক্রমিক হয়ে

পড়েছিল। অর্থাৎ কোনো রাজার মৃত্যু হলে তাঁর ছেলেই সিংহাসনে বসতেন। প্রায় সাড়ে চারশো বছর ধরে সিয়া-বংশের রাজারা রাজত্ব করেন। চীনের দ্বিতীয় রাজবংশের নাম শাং বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঙ্। এই শাং (বা য়িন) বংশের কথা তোমাদের পরে বলব।

প্লাবন ঃ চীনাদের জীবনে প্লাবন একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে। প্লাবন যেমন একদিকে তাদের দুর্দশার কারণ, অন্য দিকে তেমনি তাদের জীবনধারণের উপায়ও বটে। প্লাবনের জলে ভেজা হোয়াংহো উপত্যকার লোয়েস মাটিতে ফসল খুব ভাল ফলে। এসব কারণে চীনে প্লাবন নিয়ে বহু পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছে। এরকম অনেক কাহিনী বা অতিকথার মধ্যে একটি মানুষের কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে। তিনি হলেন 'উ'। তাঁর বাবার নাম কুন। তা হলে কাহিনীটি তোমাদের বলি।

একবার বন্যা রোধ করার দায়িত্ব পড়েছিল কুনের ওপর। অনেক ভেবে-চিন্তে কুন চলে গেলেন স্বর্গে আর সেখান থেকে চুরি করে নিয়ে এলেন এক তাল জীবন্ত মাটি। তারপর সেই মাটি দিয়ে নদীতে বাঁধ তৈরি করলেন। কিন্তু বাঁধ যতই উঁচু করলেন, জলও তত উঁচু হোল। স্বর্গের মাটি দিয়েও কুন বাঁধ তৈরি করতে পারলেন না। ওদিকে দেবলোক থেকে মাটি চুরি করার অপরাধে তাঁর হোল প্রাণদণ্ড। তিন-তিনটে বছর তাঁর সেই মৃতদেহ পড়ে রইল এক পাহাড়ের উপর, তা এতটুকু বিকৃত হোল না। শেষে একদিন তাঁর দেহ তরবারি দিয়ে কাটা হলে দেহ থেকে বেরিয়ে এল তাঁর পুত্র 'উ'।

বড়ো হয়ে 'উ' তাঁর পিতার অসম্পূর্ণ কাজে হাত দিলেন। ভূত-প্রেত-পরী আর জলজন্তুদের সাহায্য নিয়ে বহু বছরের চেষ্টায় তিনি নদীতে মস্ত বড়ো বাঁধ বাঁধলেন। বন্যাও নিয়ন্ত্রিত হোল। 'উ'-এর এই প্রশংসনীয় কাজের ফলে পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হোল। মানুষ কৃষিকাজ করতেও শিখল। অতিকথার বাইরের দিকটা বাদ দিয়ে যদি আমরা বলি যে 'উ' দেবতা বা অতিমানব নন, তা হলে ক্ষতি কি? তাঁর উদ্ভাবন করার শক্তি ছিল অসাধারণ। বাঁধ বাঁধার কাজে তাঁকে কোন ভূত, প্রেত বা পরী সাহায্য করে নি। তিনি একদল

মানুষকে সংগঠিত করে বন্যা রোধ করার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর বহু বছরের চেষ্টায় একটি মজবুত বাঁধ নির্মাণ করে বন্যার গতি রোধ করেছিলেন।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

(ক) চীনে যে পুরনো পাথর-যুগের মানুষ বাস করত, তার প্রমাণ কী ?

(খ) হোয়াংহো নদীর বন্যা-সম্বন্ধে দু-চার কথা বল।

(গ) চীনের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কী জান ?

(ঘ) পান-কু কে ? তাঁর সম্বন্ধে কী জান ?

(ঙ) চীনের পাঁচজন সাধু রাজার নাম বল। তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২। ফুসি কে ? চীনারা তাঁর কাছ থেকে কী কী জিনিস শিখেছিল ?

৩। 'উ' কে ? তিনি কোন্ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) সিয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম —। (খ) — ছিলেন শাং-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। (গ) ভারতের মতো চীনে — লেখার রেওয়াজ ছিল না। (ঘ) স্বর্গ থেকে একতাল — মাটি চুরি করে নিয়ে এসেছিলেন। (ঙ) কুনের ছেলের নাম —।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদী-উপত্যকার সভ্যতাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও চীন—সভ্যতার এই প্রাচীন চারটি কেন্দ্রের কথা তোমাদের বলেছি। এবার চারটি সভ্যতার মধ্যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা তোমাদের সংক্ষেপে বলব।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব চারটি দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ মেসোপটেমিয়া, মিশর, হরপ্পা ও চীনে মানুষের সমস্ত কর্মতৎপরতার পেছনে দেখতে পাই প্লাবন বা বন্যার

সর্বনাশা শক্তিকে। দেশগুলোর ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু এবং নদীনালার প্রকৃতিই এমন ছিল যে, সেখানকার মানুষকে প্রচুর মেহনত করতে হয়েছে। জঙ্গল কেটে চাষের জমি বার করা, জলাভূমির জল নিকাশ করা, খাল কেটে ও বাঁধ বেঁধে বন্যার জলকে চাষের কাজে লাগানো প্রভৃতি কাজ করতে হয়েছে বহু মানুষকে একত্র হয়ে। এরই ফলে নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো গ্রাম বসতি। বন্যা রোধ করার পরে পলিমাটিতে প্রচুর ফসল ফলেছে, আর সেই উদ্বৃত্ত ফসল দিয়ে চাষবাস করে না এমন একদল লোকের খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভবপর হয়েছে। এই নতুন শ্রেণীটি নানা কারিগরি বিদ্যা আয়ত্ত করার অবকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে ধাতুর আবিষ্কারও হয়েছে। ফলে, সমাজে কামার, কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, রাজ-মিস্ত্রি প্রভৃতি কারিগরদের উদ্ভব হয়েছে। গোড়ার দিকে, সমাজের অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগ ছিল কৃষি ও পশুপালন নিয়ে। পরবর্তী কালে নানা শিল্পসৃষ্টির কাজেও মানুষ তৎপর হয়ে উঠেছে। শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজের প্রসার হয়েছে। আবার উন্নত ধরনের যানবাহনও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে খুব সহায়ক হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজনেই এর পরে নগরের উদ্ভব হয়েছে। তামা ও ব্রোঞ্জের আবিষ্কারের পর থেকে প্রাচীন সভ্যতার চারটি কেন্দ্রেই পরিণত নগর-সভ্যতার প্রকাশ দেখতে পাই।

আবার কৃষিনির্ভর গ্রামজীবন থেকে শিল্প-বাণিজ্য-নির্ভর নগর-জীবনে এই যে রূপান্তর, তা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনেও একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সহযোগিতা ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে হাজার হাজার বছরের পুরনো গোষ্ঠীজীবন ভেঙে গিয়ে একটা নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছিল। ফসল বা শিল্পজাত দ্রব্যে উৎপাদনকারীর এতদিন যে-অধিকার ছিল, সে অধিকারও আর রইল না। এদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাও সামাজিক স্বীকৃতি পেল। একদল লোকের হাতে প্রচুর সম্পদ্ মজুত হওয়ার ফলেই এমন একটা অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। বাড়তি ফসল আর বাড়তি জিনিস উৎপাদন করার দায়িত্ব পড়ল যাদের ওপর, সেই বাড়তি ফসল আর বাড়তি জিনিসে তাদের অধিকার

রইল না এতটুকু। এইভাবে গোষ্ঠী-জীবনের শোষণহীন, শ্রেণীহীন সমাজের জায়গায় জন্মলাভ করল শোষক ও শোষিতের সমাজ। দেশের মানুষের মধ্যে বিপুলসংখ্যক ক্রীতদাস এরকম একটা অবস্থা তৈরি করতে খুবই সাহায্য করেছিল। ক্রীতদাসদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল যুদ্ধবন্দী। অনেকে ঋণ শোধ করতে না পেরেও বাধ্য হয়ে ক্রীতদাস হোত। এই ক্রীতদাসের মালিকরা ক্রমেই বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল। যার যত ক্রীতদাস, সে তত ধনী—এরকম একটা অর্থনৈতিক অবস্থা চারটি নদী-উপত্যকাতেই দেখতে পাই।

নতুন অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রভাব সামাজিক জীবনের ওপরেও পড়েছিল। এবার তোমাদের সামাজিক জীবনের কথা বলব।

সামাজিক জীবন ঃ চারটি দেশেই সমাজের সবচেয়ে ওপরের তলায় দেখতে পাই রাজা ও পুরোহিতদের। সভ্যতার আদিকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে ভয় করত ; আর এর ফলে তারা জাতুশক্তিতে খুব বিশ্বাস করত। এ কারণেই মানুষের ওপর পুরোহিতদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। সুমেরীয় ও মিশরীয় সমাজে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও সেনাপতিরাও ছিলেন প্রথম সারির লোক। তাঁদের নিচেই ছিল বণিক, কারিগর, কৃষক প্রভৃতি। সমাজের একেবারে নিচে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস। ক্রীতদাসদের কোনও মানবিক অধিকারই ছিল না। অথচ এদেরই অমানুষিক পরিশ্রমে বড়ো বড়ো বাঁধ নির্মিত হয়েছে, গড়ে উঠেছে অতিকায় পিরামিড, উৎপন্ন হয়েছে নানা শিল্পজাত দ্রব্য। সিন্ধু উপত্যকা ও চীনের সমাজে চার শ্রেণীর লোকের দেখা পাই। সিন্ধু উপত্যকায় সমাজের সবচেয়ে উঁচু তলার লোক বলতে বোঝায় পুরোহিত, দৈবজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের। চীনে মান্দারিন বা লেখাপড়া-জানা মানুষ ছিল এই শ্রেণীর লোক। যোদ্ধা, বণিক ও কারিগর নিয়ে গড়ে উঠেছিল সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীটি। আর সকলের নিচে ছিল ক্রীতদাস। সুমের ও মিশরের রাজারা যুদ্ধ জয় করে যে-অসংখ্য ক্রীতদাস, ধনরত্ন ও জমিজমা লাভ করতেন, তার একটা মোটা অংশ উপহার দিতেন দেবমন্দিরকে, আর ছিটেফোঁটা অন্যদের। ফলে ঐ দুই দেশের মন্দিরে ক্রীতদাস ও সম্পদ্ ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল। এই

ধন-সম্পদ্ ভোগ করতেন পুরোহিতরা। জ্ঞানচর্চার জন্যে পুরোহিতরা যথেষ্ট অবকাশও পেতেন। মানুষের সভ্যতায় সুমেরীয় ও মিশরীয়দের যত কিছু অবদান, তার বেশির ভাগই সৃষ্টি করেছিলেন পুরোহিতরা।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও চীনে এক একটি উন্নত নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। নারী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরত। অলঙ্কারও নানা-রকমের ছিল; ধাতুর, ঝিনুকের, মূল্যবান্ পাথরের, তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা ও রূপোর। নানারকম প্রসাধনসামগ্রী, আসবাবপত্র প্রভৃতি যা এ ক'টি পলিমাটি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে, তা থেকেও বোঝা যায় যে, মানুষ খুব সৌখিন ছিল। নানা রকমের কারুকার্য করা বাসনকোসন ও যন্ত্রপাতির মধ্যে তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্মবিশ্বাসেও চারটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। পরলোকে বিশ্বাসের ফলে তারা মৃতদেহকে যত্ন করে কবর দিত এবং মৃতদেহের কাছে মৃতব্যক্তির আসবাবপত্র, গয়নাগাঁটি ও খাদ্যদ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখত।

যেমন সুমের ও মিশরে, তেমনি সিন্ধু উপত্যকায় ও চীনে দেখতে পাই মানুষ বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস করত। মানুষ তখনও প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ভয় করত, ভয় করত হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকেও। গাছপালা ও জীবজন্তুকে দেবতাজ্ঞানে তারা যেমন পুজো করত, তেমনি করত আকাশ, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে। মাতৃকা-দেবীর পুজোও ছিল খুব জনপ্রিয়। সুমেরীয় ও মিশরীয়দের কল্পনায় এক-একটি দেবতা ছিলেন এক-একটি প্রাকৃতিক শক্তির আধার। সুমেরে অনু, এনলিল, সামাস (সূর্য দেবতা), নান্না (চন্দ্র দেবতা), ইনান্না প্রভৃতি দেব-দেবী। মাতৃকা-দেবীর নাম নিন্না; জলের দেবতা এঙ্কি। মিশরে হোরাস, ওসিরিস, আইসিস ও সূর্য-দেবতা 'রা' বা আমন। সিন্ধু উপত্যকায় পশুপতি শিব ও মাতৃকা-দেবীর পুজো প্রচলিত ছিল। চীনদেশের মানুষও নানা জীবজন্তু ও প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করত।

অনুশীলনী

১। সভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্রগুলোতে নদীর ধারে গ্রাম-বসতি গড়ে উঠেছিল কেন?

২। মেসোপটেমিয়া, মিশর, সিন্ধু উপত্যকা ও চীনে সমাজের একেবারে নিচু তলার লোক কারা? তাদের সম্বন্ধে কী জান?

৩। সমাজে কাদের বেশি প্রভাব ছিল এবং কেন?

৪। কয়েকজন সুমেরীয় ও মিশরীয় দেব-দেবীর নাম কর।

পঞ্চম অধ্যায়

লৌহযুগের সমাজ

লোহার আবিষ্কার ও তার ফলঃ লোহা কবে এবং কারা আবিষ্কার করেছিল, তা আমরা আজও জানি না। চকমকি পাথরের মতো লোহা দীর্ঘদিন থাকে না, জলে-বৃষ্টিতে লোহা নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ যখন থেকে লোহার ব্যবহার শুরু করেছিল তখন থেকেই লৌহ-যুগের শুরু। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানুষ লোহার যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে। সুতরাং, কোথাও লৌহযুগ শুরু হয়েছে আগে, কোথাও পরে। লোহাকে ঢালাই করে নিয়ে যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করার কৌশলটি আর্মেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের হিটাইটরা জানত। প্রায় সাতশো বছর ধরে (১৯০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত) হিটাইটরা লোহার অস্ত্রের জোরে এশিয়া মাইনরে একাধিপত্য করে। হিটাইট সাম্রাজ্যের পতনের পরে এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন অঞ্চলে লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আসিরীয়রা লোহার হাতিয়ার আর যুদ্ধরথ ব্যবহার করে যে-সাম্রাজ্যটি গড়ে তুলেছিল, সে যুগে তা ছিল সবচেয়ে বড়ো। এশিয়া মাইনর এবং নিকট প্রাচ্যের দেশগুলোতে ধীরে ধীরে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। ইয়োরোপের দেশগুলোর মধ্যে প্রথম গ্রীসে ও ইতালিতে লোহা নিয়ে মানুষ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র গড়তে শুরু করে। গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল। লোহার ব্যবহার জানত ফিনিসীয়রা। সীডন, 'বিব্লস্,

টায়ার, কার্থেজ প্রভৃতি ফিনিসীয় বন্দরে লোহার জিনিসপত্র নিয়মিত বেচাকেনা হোত। টাইবার নদী আর ইতালির পশ্চিম উপ-কূলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এট্রাসকানরা বাস করত। তারাও লোহার ব্যবহার জানত। মিশরে এবং ইয়োরোপে লোহার ব্যবহার শুরু হয় প্রায় একই সময়ে, ৭০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। ভারত থেকে এক সময়ে তাল তাল লোহার খণ্ড রোমে রপ্তানি হোত। তবে দৈনন্দিন জীবনে লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল বোধ হয় ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে। এর কিছুকাল পরে চীনদেশেও লোহার ব্যবহার শুরু হয়।

লোহা আবিষ্কারের ফল ঃ এশিয়া ও ইয়োরোপের কয়েকটি জায়গায় আকরিক লোহার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। তারপর থেকেই লোহা ঢালাই করে নানারকম যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতে থাকে। তামা বা ব্রোঞ্জের তুলনায় লোহার যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার অনেক বেশি মজবুত। লোহার হাতিয়ারের জোরে হিটাইট, আসিরীয় প্রভৃতি জাতি প্রাচীন পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। গ্রীকরা লোহার বর্ম পরে হাজার হাজার পারসিক সৈন্যকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। লোহার যন্ত্রপাতি সস্তাও। লোহার যন্ত্রপাতি তৈরি হবার পর থেকে ছোটখাটো কারিগরদের খুবই সুবিধে হয়েছিল। আগের তুলনায় তারা অনেক বেশি জিনিসপত্র তৈরি করতে লাগল। লোহার লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা শুরু হতেই ক্ষেতেও আগের তুলনায় বেশী পরিমাণে ফসল ফলতে লাগল। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন উৎপাদন বাড়ল, তেমনি চলাচলের ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে আগেকার তুলনায় পরিবহণ-ব্যয়ও অনেক কমে গেল।

সামাজিক জীবন ঃ ব্রোঞ্জযুগের মতো লৌহযুগের সমাজও কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সমাজের একেবারে ওপরের তলায় রাজা এবং সম্ভ্রান্তবংশীয়রা, তাঁদের নিচে মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণী। সাধারণ শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতিকে নিয়ে ছিল তৃতীয় একটি শ্রেণী। সকলের নিচে ক্রীতদাস। লৌহযুগের সমাজে মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বলতে বোঝায় বণিক, কারিগর, লিপিকর, শিল্পী, শিক্ষক প্রভৃতিকে। লৌহযুগে সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই

মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে, জীবনধারণের জন্যে একমাত্র রাজার অনুগ্রহের ওপর তাদের নির্ভর করতে হোত না। লৌহযুগে মস্ত বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি অসংখ্য মানুষ ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। ঋণের দায়েও মানুষকে ক্রীতদাসত্ব করতে হোত। লৌহযুগের স্বাধীন নাগরিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবন ক্রীতদাসের তুলনায় খুব একটা ভাল ছিল না। গ্রীকরা তো ক্রীতদাসদের দিয়েই সব কাজ করিয়ে নিত। গ্রীক-সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল ক্রীতদাস-প্রথা। এথেন্স নগরে নাকি এক সময়ে ১,১৫,০০০ ক্রীতদাস ছিল, অর্থাৎ নগরের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ক্রীতদাস-প্রথা গ্রীস থেকে রোমে চালান হয়। তবে রোমের ক্রীতদাসদের জীবন অপেক্ষা গ্রীসের ক্রীতদাসদের জীবন অনেক ভাল ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ লোহার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পর থেকে কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বেড়ে গিয়েছিল এবং কৃষক ও কারিগরের কাজের পক্ষেও খুব সুবিধে হয়েছিল, এ কথা তোমাদের আগেই বলেছি। লৌহযুগে চলাচল-ব্যবস্থারও খুব উন্নতি হয়। ফলে, শিল্প-বাণিজ্যের খুব প্রসার হয়। বাণিজ্যে ফিনিসীয়রা খুবই পারদর্শী ছিল। তারা কাঠ দিয়ে সুন্দর সুন্দর নৌকো তৈরি করত। পাল এবং দাঁড়ের সাহায্যে নৌকোগুলো চলত। ক্রীতদাসরা দাঁড় টানত। সে যুগে ফিনিসীয়দের মতো দুঃসাহসী ও দুর্দান্ত আর কেউ ছিল না। তারা সমুদ্রে জল-দস্যুতা করত। সীডন, টায়ার, কার্থেজ প্রভৃতি শহর ফিনিসীয়রাই নির্মাণ করেছিল। ব্রোঞ্জযুগে মিশরের ফারাওরা নানারকম কাঁচা মাল ও বিলাসদ্রব্য আনাতেন বাইরে থেকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন, সিনাই থেকে তামা
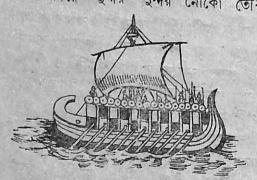
ফিনিসীয় জাহাজ

আনার জন্যে ফারাওদের সৈন্য পাঠাতে হোত। লৌহযুগের পারসিক সম্রাটদের বা ৩য় থুথমোস, আমেনহোতেপ, ২য় রামেশিসের মতো মিশরীয় রাজাদের এ অসুবিধে ছিল না। তাঁদের সাম্রাজ্যে মোটামুটি সবরকম কাঁচা মাল এবং বিলাসদ্রব্য পাওয়া যেত। পারস্ত-সম্রাট দারায়ুস সুসায় তাঁর রাজপ্রাসাদটি নির্মাণ করার জন্যে সীডার ও ওক কাঠ, সোনা, রূপো, তামা, ব্রোঞ্জ ও হাতির দাঁত প্রভৃতি সবই আনিয়েছিলেন তাঁরই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। লৌহযুগে জিনিসপত্রের পরিমাপ ও ওজনের ব্যবস্থাও আগেকার তুলনায় উন্নত হয়েছিল। ৬০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের পর থেকে এথেন্স, করিন্থ প্রভৃতি নগর-রাষ্ট্রগুলোতে অল্পমূল্যে রূপো ও তামার মুদ্রার প্রচলন হয়। ফলে বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অসুবিধেও অনেকটা দূর হয়। ফিনিসীয় বণিকরা সুমেরীয় ও মিশরীয় লিপি সহজে

ফিনিসীয়	প্রাচীন গ্রীক	পরবর্তী গ্রীক	ল্যাটিন	ইংরেজী
𐤀	A	A	A	A
𐤁	S B	B	B	B

ফিনিসীয় লিপি

বোধগম্য করার জন্যে এক রকম অক্ষরের প্রবর্তন করেছিল। গ্রীকরা ফিনিসীয় ভাষা থেকেই গ্রীক ভাষার সৃষ্টি করে। তোমরা হয়তো জানো না যে, গ্রীক ভাষা থেকেই পরে ইয়োরোপের নানা ভাষায় জন্ম হয়। ফিনিসীয়দের এবং পরে গ্রীকদের চেষ্টায় সহজে বোধগম্য লিপির আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব সুবিধে হয়েছিল।

রাজতন্ত্রের ধারণা ঃ আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে ব্রোঞ্জযুগের মতোই রাজার শাসন বা রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইজরায়েল, লিডিয়া, ফ্রিজিয়া, আর্মেনিয়া, মীডিয়া, পারস্ত প্রভৃতি রাজ্যেও ছিল রাজার শাসন। তবে পারসিক সম্রাটরা স্থানীয় শাসনকর্তাদের ওপর শাসনের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে নিয়মিত রাজস্ব পেলেই তাঁরা খুশি থাকতেন।

চীনে চৌ-বংশের রাজারা তাঁদের রাজ্যে সামন্ত-প্রথার প্রবর্তন করেন। তাঁরা রাজ্যের জমিজমা কয়েকজন জমিদারের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। জমিদাররা রাজাকে নিয়মিত কর দিতেন এবং যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। এথেন্স, স্পার্টা, থিবস্, করিন্থ প্রভৃতি ছোটো ছোটো নগর-রাষ্ট্রগুলোর কোনোটাতে ছিল রাজার শাসন, কোনোটাতে জনগণের শাসন। যেখানে যেখানে রাজতন্ত্র ছিল, সেখানেও জনতার প্রতিনিধিদের পরামর্শ নিয়ে রাজা শাসন করতেন।

মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া এবং নানা সেমিটিক জাতি ও উপজাতির মানুষ ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতাকে বহন করে নিয়ে এসেছে লৌহযুগে। ইন্দো-ইয়োরোপীয় গ্রীকজাতি এই সভ্যতায় সভ্য হয়েছে। গ্রীকদের কাছ থেকে সভ্যতার আলো গিয়ে পৌঁছেছে রোমে। গড়ে উঠেছে মস্ত বড়ো রোম-সাম্রাজ্য। তারপর থেকেই ইয়োরোপের দিকে দিকে সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ল। আমরাও এই সভ্যতার উত্তরাধিকারী।

অনুশীলনী

১। কোন্ সময়টাকে লৌহযুগ বলে? কোথায় এবং কখন্ লোহার ব্যবহার শুরু হয়?

২। লোহা আবিষ্কারের ফল কী?

৩। লৌহযুগের সামাজিক জীবন কেমন ছিল?

৪। লৌহযুগের অর্থনৈতিক জীবন-সম্বন্ধে কী জান?

৫। লৌহযুগের রাষ্ট্রগুলোর শাসন-ব্যবস্থা কেমন ছিল?

৬। ভুল শুদ্ধ কর:

(ক) এশিয়া মাইনরে লোহার ব্যবহার শুরু করে মিশরীয়রা।

(খ) রোমানরা লোহার ব্যবহার শিখেছিল মিশরীয়দের কাছ থেকে।

(গ) লোহার যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন কমে গিয়েছিল।

(ঘ) সীডন, টায়ার, কার্থেজ প্রভৃতি নগর তৈরি করেছিল গ্রীকরা।

(ঙ) চীনের চৌ-বংশের রাজারা তাঁদের রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) —নদী আর ইতালির পশ্চিম উপকূলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এট্রাসকানরা বাস করত। (টাইগ্রীস/টাইবার)

(খ) এথেন্সের মোট লোকসংখ্যার এক—(চতুর্থাংশ/তৃতীয়াংশ) ছিল ক্রীতদাস।

(গ) দারায়ুস একজন—(মিশরীয়/পারসিক) সম্রাটের নাম।

(ঘ) —(মিশরীয়/পারসিক) সম্রাটরা স্থানীয় শাসনকর্তাদের ওপর শাসনের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লৌহযুগের কয়েকটি সভ্যতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যাবিলন

ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস : সুমেরের উত্তর-পশ্চিম দিকে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে ছিল ব্যাবিলন নামে ছোটো একটি শহর। এই ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলের একটি উপজাতি। রাজধানী ব্যাবিলনের নাম অনুসারে রাজ্যটির নাম হয় ব্যাবিলোনিয়া। ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবির নামটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। হামুরাবি তাঁর বংশের ষষ্ঠ রাজা। আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে তিনি ব্যাবিলনে রাজত্ব করে গেছেন। তিনি ছিলেন মস্ত বড়ো এক যোদ্ধা। সমগ্র মেসোপটেমিয়া তিনি অধিকার করেন। কিন্তু বিজয়ী হামুরাবির চেয়ে আইন-প্রণেতা হামুরাবিকে পরবর্তী কালের মানুষ বেশি করে মনে রেখেছে। বাস্তবিকই হামুরাবি ছিলেন প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে একজন। তিনি গোলাকার একটি পাথরের স্তম্ভে কতকগুলো আইন খোদাই করে রেখে গিয়েছেন। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে সুসার একটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে স্তম্ভটি পাওয়া গেছে।

ব্যাবিলনের ঠিক উত্তরেই ছিল অসুর নামে একটি নগর। এক সময়ে অসুর ব্যাবিলনের অধীনে ছিল। কিন্তু পরে অসুরকে কেন্দ্র করে মস্ত বড়ো আসিরীর সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আসিরিয়ার রাজা প্রথম তিগলথ পিলেজার ব্যাবিলন ও মিশর অধিকার করেন।
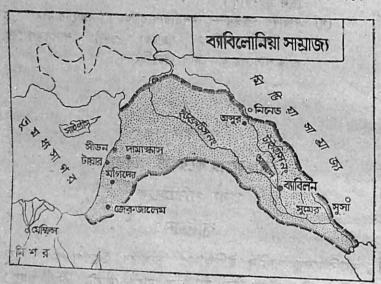
আসিরীয়রা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। তারা লোহার হাতিয়ার নিয়ে রথে চড়ে যুদ্ধ করত। একরকম মুদ্গর-যন্ত্রের সাহায্যে তারা শত্রুপক্ষের প্রাচীর ভেঙে ফেলত। এ কৌশলটি তারাই প্রথম আবিষ্কার করে। আসিরীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে কেউই পেরে উঠত না। আসিরীয় সম্রাট অসুরবানিপাল রাজধানী নিনেভে নগরে একটি প্রকাণ্ড পাঠাগার নির্মাণ করেছিলেন। অসুরবানিপালের মৃত্যুর পর কিছুদিন যেতে না-যেতেই আসিরীয় সাম্রাজ্যের পতন হয়। কাল্ডি রাজবংশের অধীনে ব্যাবিলনের ইতিহাসেও তার একটি গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। এই নতুন ব্যাবিলোনিয়া-সাম্রাজ্যের এক রাজার নাম নেবুকাদনেজার (২য়)। তিনি মীডিয়ার রাজকুমারী এমাইটিসকে বিয়ে করেছিলেন। এই রানীকে খুশি করার জন্যে নেবুকাদনেজার ব্যাবিলনে একটি ঝুলন্ত উদ্যান তৈরি করেছিলেন। ব্যাবিলনের এই শূন্য-উদ্যানটি প্রাচীন পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের অন্যতম। সে

যুগে ব্যাবিলনের মতো নগর আর ছিল না। ৫৩৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পারস্ত-সম্রাট দ্বিতীয় সাইরাস ব্যাবিলন অধিকার করেন।

কৃষিঃ সুমেরের মতো ব্যাবিলনেও প্রধানত জলসেচের সাহায্যে কৃষিকাজ করা হোত। যুদ্ধ-জয়, মন্দির-নির্মাণ, সেচখাল খনন করা, পুরনো খালের সংস্কার করা প্রভৃতিকে ব্যাবিলনের রাজারা খুব গৌরবের কাজ বলে মনে করতেন। হামুরাবির বহুকাল আগে একটি মস্ত বড়ো খাল কাটিয়েছিলন লগাসের এক শাসনকর্তা। হামুরাবি সেই খালটি আবার নতুন করে কাটিয়েছিলেন। সেচখালগুলোর মুখ বন্যার সময়ে পলিমাটিতে বুজে যেত। প্রতি বছরই খালের মুখ থেকে সেই মাটি সরিয়ে দিতে হোত। চাষের কাজ করত কৃষকরা আর ক্রীতদাসরা। কৃষকরা শাদুফের সাহায্যে জমিতে জল দিত। তারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করত। জমি চষা এবং বীজ বোনা হয়ে গেলে চাষীরা দেবী নিনকিলিমের কাছে প্রার্থনা জানাত যাতে ইঁদুর ও পোকামাকড়ের হাত থেকে মাঠের ফসল রক্ষা পায়। শস্যের মধ্যে বার্লি, গম ও যব ছিল প্রধান। ক্ষেতে কুমড়ো, তরমুজ, পেঁয়াজ, রসুন, সরষে প্রভৃতি জন্মাত। বাগানে ফলত ডুমুর, আঙুর, পীচ, জলপাই প্রভৃতি ফল। সবচেয়ে বেশি ফলত খেজুর।

বাণিজ্যঃ ব্যাবিলনে ধাতু, মূল্যবান্ পাথর এবং দামী কাঠ পাওয়া যেত না। এসব আনতে হোত বাইরে থেকে। নানা রকম বিলাসদ্রব্যও আমদানি করতে হোত। ব্যাবিলনে শিল্প ও বাণিজ্যের খুবই প্রসার হয়েছিল। বণিকরা চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে জিনিসপত্র, ফসল ইত্যাদি ধার নিত। সুদের সর্বোচ্চ হার হামুরাবি আইন করে বেঁধে দিয়েছিলেন। ব্যাবিলনের সঙ্গে তখন পৃথিবীর নানা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। সিন্ধু-উপত্যকা, পারস্ত, আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া, আনাতোলিয়া, সিরিয়া এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলো থেকে হাজার হাজার বাণিজ্যতরী কত না দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসত। একদিকে পারস্ত উপসাগর, অন্যদিকে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীপথ দিয়ে এই বাণিজ্য চলত। আবার মরুভূমির ওপর দিয়ে ভারবাহী পশুর পিঠে মালপত্র চাপিয়ে

সওদাগরেরা আসত ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনের বণিকদের নিজেদের সঙ্ঘ ছিল। সে-যুগের যে-সমস্ত লেখা পাওয়া গেছে তাতে বিক্রয়, ঋণ, চুক্তি, অংশীদারী ব্যবসা, দস্তুরি, বিনিময়, হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাবিলনের যে খুবই সমৃদ্ধি হয়েছিল, এসব তারই প্রমাণ। ব্যাবিলনে শেকেল, মীনা, ট্যালেণ্ট প্রভৃতি মুদ্রার প্রচলন ছিল। ৬০টি শেকেল ছিল ১টি মীনার সমান, আবার ৬০টি মীনার সমান ছিল ১টি ট্যালেণ্ট।

মন্দির ও পুরোহিতঃ ব্যাবিলনের মানুষের কাছে রাজা ছিলেন দেবতার প্রতিনিধি। প্রজারা কর দিত দেবতাকে; কর জমাও হোত দেবমন্দিরে। সমাজে পুরোহিতদের অসাধারণ প্রভাব ছিল। রাজা-যে দেবতার প্রতিনিধি, জনমনে এ ধারণা গড়ে তোলার কাজটি পুরোহিতরাই করতেন। নগরদেবতা মার্দুককে নিয়ে পুরোহিতের পোশাক পরেই রাজা পথে শোভাযাত্রায় বের হতেন। ব্যাবিলনীয়রা দেবতার পুজো ও নানা রকম যাগযজ্ঞে বিশ্বাস করত। তা ছাড়া, তারা জাদুশক্তিতেও বিশ্বাস করত। এর ফলে তাদের ওপর পুরোহিতদের প্রভাব ছিল রাজার চেয়েও বেশি। রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়ও সেখানে বরাবরই পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল। পুরোহিতরাই বিচার করতেন, বিচারসভা বসত দেবমন্দিরে।

যুদ্ধজয়ের মতো নতুন নতুন দেবমন্দির-নির্মাণ এবং পুরানো মন্দিরের সংস্কার করাকে রাজারা গৌরবের কাজ বলে মনে করতেন। যুদ্ধজয় করে নতুন দেশ থেকে রাজা যেসব ধনরত্ন ও ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী নিয়ে আসতেন, তার একটা মোটা ভাগ তিনি দেবমন্দিরকে উপহার দিতেন। ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা এবং সাধারণ গরীবদুঃখীও নিজ নিজ সাধ্যমত ফসল ও নানারকম দ্রব্যসামগ্রী দেবমন্দিরকে উপহার দিত। এভাবেই দেবমন্দিরগুলো বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিল। এক দিকে যেমন দেবমন্দিরে বিপুল-পরিমাণ সোনা-রূপা ও ধনরত্ন, দামী দামী আসবাবপত্র জমা হয়েছিল, তেমনি ছিল অসংখ্য দাসদাসী। দেশের মোট জমিজমার একটা বিরাট অংশ ছিল দেব-মন্দিরের নিজস্ব সম্পত্তি। সেই জমিতে ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষ করানো হোত। ফসল জমা হোত দেবমন্দিরে। ক্রীতদাসরা নানা-

রকম কারিগরি বিদ্যা জানত। তাদের খাটিয়ে পুরোহিতরা নানা-রকম জিনিস তৈরি করাতেন।

পুরোহিতরা মন্দিরের এসব ধন-সম্পদ্ সরাসরি ভোগ করতেন না বটে, তবে এগুলো দিয়ে তাঁরা মহাজনী কারবার করতেন। অনেকে পুরোহিতদের কাছে ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখত। দেব-মন্দিরগুলো সেকালে ব্যাঙ্কের মতোই কাজ করত।

ব্যাবিলোনিয়ায় প্রত্যেক নগরের জন্যে ছিল আলাদা আলাদা দেবতা, ; যেমন, লারসার সামাস, উরুকের ঈশ্‌তার, উরের নান্নার এবং ব্যাবিলনের মার্দুক।

জ্ঞান ও সংস্কৃতি ঃ ব্যাবিলনের পুরোহিতরা সেই সুদূর প্রাচীন-কালেই জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করতেন। তাঁরা মাটির টালির ওপর লিখতেন। সম্রাট অসুরবানিপালের রাজধানী নিনেভে নগরে একটি প্রকাণ্ড পাঠাগার আবিষ্কৃত হয়েছে। তাতে ইটের ওপরে লেখা প্রায় কুড়ি হাজার বই পাওয়া গেছে। বইগুলোর মধ্যে আছে অভিধান ও ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি। ব্যাবিলনের পুরোহিতরা বাণিজ্যের প্রয়োজনে গণিতের চর্চা করতেন। তাঁরা বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করেছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত দ্বাদশ রাশি তাঁদেরই আবিষ্কার। পুরোহিতরা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন। এর জন্যে তাঁরা আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান প্রভৃতি লক্ষ্য করতেন। এভাবেই তখন থেকে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। ব্যাবিলনীয়রা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটি গ্রহের সঙ্গে পরিচিত ছিল। প্রত্যেকটি গ্রহ ছিল এক-একজন দেব-দেবী, যেমন—মঙ্গল **নারগল,** বুধ **নাবু,** বৃহস্পতি **মার্দুক,** শুক্র **ঈশ্‌তার,** শনি **নিনিব,** সূর্য **সামাস,** চন্দ্র **সীন** ইত্যাদি। ব্যাবিলনীয়রা বছরকে বারো মাসে এবং মাসকে চার সপ্তাহে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক দিনকে তাঁরা বারো ঘণ্টায় ভাগ করেছিলেন। বিষুবরেখাকে ৩৬০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করাও তাঁদেরই কীর্তি। তাঁদেরই চেষ্টার ফলে গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান-সঙ্কলন, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস লেখা প্রভৃতি নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হামুরাবির আইনঃ প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে ব্যাবিলনের রাজা হামুরাবি একজন। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, দিগ্বিজয়ী বীর এবং বিচক্ষণ আইন-প্রণেতা এই রাজার নাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসনের জন্যে প্রাচীন আইন-গুলোকে সঙ্কলন করে একটি আট ফুট লম্বা গোলাকার পাথরের স্তম্ভের ওপর খোদাই করে রেখে গিয়েছেন। হামুরাবির পরেও বহুকাল ধরে তাঁর আইন-অনুসারে ব্যাবিলনে শাসনের কাজ পরিচালিত হোত। হামুরাবির লেখা ৫০ খানা চিঠি থেকেও বোঝা যায়, তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্যে কি রকম পরিশ্রম করতেন।

হামুরাবির আইন প্রাপ্তি

আধুনিক পণ্ডিতরা হামুরাবির আইনগুলোকে ২৮২টি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, চুরি ও ডাকাতি করা, স্ত্রীলোকের অসৎ জীবন যাপন করা, চুরি করা জিনিসপত্র রেখে দেওয়া, পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাসকে আশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ড হোত। প্রাণদণ্ড দেওয়া হোত কখনো আগুনে পুড়িয়ে অথবা জলে ডুবিয়ে, আবার কখনও অঙ্গচ্ছেদ করে। হামুরাবি আইন করে কারিগরদের সর্বোচ্চ বেতন ও মজুরি বেঁধে দিয়েছিলেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্যে সুদের সর্বোচ্চ হারও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। আইনে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়েছে। চুরি-ডাকাতি করার পরে চোর বা ডাকাত ধরা না পড়লে সেটা রাষ্ট্রের অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হোত। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দিত। এরকম

আইন আজকের দিনেও পৃথিবীর কোনও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে বোধ হয় নেই। হামুরাবি ধন-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার বিধিবদ্ধ করেন। মৃত স্বামীর ঘরবাড়ি ও ভূসম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর অধিকারকেও তিনি স্বীকৃতি দেন।

হামুরাবির বিভিন্ন আইন থেকে তখনকার ব্যাবিলনের সমাজ-জীবনের একটা ছবি এঁকে নেওয়া যায়।

সমাজ ঃ ব্যাবিলনীয় সমাজকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ধনী ও অভিজাত বংশের লোক, যোদ্ধা ও রাজ-কর্মচারীরা ছিলেন সমাজের সবচেয়ে ওপরের তলায় মানুষ। তার পরের ধাপে ফেলা যায় সাধারণ মানুষ, বণিক, কৃষক ও কারিগরদের। সকলের নিচে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস। সমাজে সম্ভ্রান্ত পরিবার-গুলোর এবং পুরোহিতদের প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি ওপর তলার মানুষের সুখ-সুবিধা বাড়িয়েছিল ; কিন্তু খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের ভাগ্যের খুব একটা হেরফের হয় নি। পুরোহিতরা ধর্মাচরণ ও অর্থোপার্জন একই সঙ্গে করতেন এবং তাতে তাঁদের ওপরে জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা এতটুকু কমে নি। সাধারণ মানুষ তার ধর্মবিশ্বাসটুকু সম্বল করে কষ্টেসৃষ্টে জীবন যাপন করত।

অনুশীলনী

১। হামুরাবি কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?
২। ব্যাবিলনের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে বল।
৩। ব্যাবিলনের কৃষি ও বাণিজ্য নিয়ে সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ লেখ।
৪। ব্যাবিলনের পুরোহিতদের সম্বন্ধে কী জান?
৫। মানব-সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান কী?
৬। হামুরাবির আইন সম্বন্ধে কী জান?
৭। ব্যাবিলনের সমাজ কেমন ছিল?
৮। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) আসিরীয়দের সম্বন্ধে কী জান? (খ) নেবুকাদনেজার কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান? (গ) ব্যাবিলনের কয়েকটি মুদ্রার নাম কর। (ঘ) ব্যাবিলনীয়রা ক'টি গ্রহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? গ্রহগুলো কী কী?

৯। শুদ্ধ করে লেখ :

(ক) ব্যাবিলন শহরটি ছিল টাইগ্রীস নদীর তীরে। (খ) আসিরীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন অসুরবানিপাল। (গ) অসুরবানিপালের রানীর নাম এমাইটিস। (ঘ) ব্যাবিলনের যাটটি শেকেল ছিল একটি ট্যালেণ্টের সমান। (ঙ) ব্যাবিলনীয়রা বিষুবরেখাকে ৩০০ ডিগ্রিতে বিভক্ত করেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী মিশর

প্রায় তু'হাজার বছর ধরে ত্রিশটি রাজবংশ প্রাচীন মিশরে রাজত্ব করে। ২৭৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৪০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশো বছর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাজবংশের রাজারা মিশর শাসন করে। এর পরের কয়েকটি রাজবংশের ইতিহাস জানা যায় নি। দ্বাদশ রাজবংশের শাসনকাল শুরু হয় ২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এবং শেষ হয় ১৭৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। পরবর্তী দেড়শো বছরের ইতিহাস অন্ধকারে ঢাকা। এই সময়ে যাযাবর হিকসসরা মিশরে রাজত্ব করে। প্রথম আমোসের সময় থেকেই মিশরের গৌরবের যুগের শুরু হয়। ১৫৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ১০৯০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ, এই পাঁচশো বছরকে মিশরের সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগ বলা হয়। প্রথম আমোসে হিকসসদের বিতাড়িত করেন। তিনিই অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

মিশরীয় উপনিবেশ : মিটানিয়ান হিটাইট এবং আসিরীয়দের সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলে মিশরীয়দের মনেও দেশ-জয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। এদিকে হিকসসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মিশরীয়রা যুদ্ধবিদ্যায় রীতিমতো পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। আমোসের পরে প্রথম থুথমোস আসিরীয়দের পরাজিত করে ব্যাবিলন অধিকার করেন। তিনি প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার বিরুদ্ধেও অভিযান করেন। ঐ তুটি স্থানের কয়েকটি নগরও তাঁর হস্তগত হয়। এর ফলে মিশরের খুবই লাভ হয়। ঐ সব অঞ্চল থেকে মিশরীয়রা বহু দাস-দাসী, যুদ্ধাস্ত্র লাভ করে এবং প্রচুর সোনা-রুপো এনে তাদের রাজকোষের সম্পদ বৃদ্ধি করে।

পরবর্তী ফারাওরা পশ্চিম এশিয়ায় একটির পর একটি দেশ জয় করতে থাকেন। এইসব দিগ্বিজয়ী রাজাদের মধ্যে তৃতীয় থুথমোসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নানা দেশ জয় করে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। আবিসিনিয়া থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। কার্ণাকের মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিতে তাঁর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। সিংহাসনে বসেই তিনি সিরিয়াকে মিশরীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ছাড়াও, তিনি পশ্চিম এশিয়ার আরও কয়েকটি জায়গা অধিকার করেন। তাঁর নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি দ্বীপ দখল করে। মোট কথা, তৃতীয় থুথমোসের চেষ্টায় মিশর ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-উপকূলের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। দ্বিতীয় আমেনহোতেপের আমলে সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি কঠোর হস্তে সেই বিদ্রোহ দমন করেন। ফারাও তৃতীয় আমেনহোতেপের সময়ে মিশর একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তিতে মিশর ছিল অদ্বিতীয়। রাজধানী থিবস্ ঐশ্বর্য আর জাঁকজমকে ছিল অতুলনীয়। তার পথে পথে নানাদেশী সওদাগরদের ভীড়, তার বাজারে বাজারে পৃথিবীর নানাদেশের দ্রব্যসামগ্রী, তার প্রাসাদতুল্য সারি সারি অট্টালিকার অপূর্ব সৌন্দর্য। করদরাজ্যগুলো থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিয়ে এসে ফারাওরা সেই সম্পদ দিয়ে যেসব প্রাসাদ, মন্দির ও পিরামিড নির্মাণ করেছেন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্পের ইতিহাসে আজও তা অতুলনীয়।

তৃতীয় আমেনহোতেপের পর তাঁর পুত্র চতুর্থ আমেনহোতেপ মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে এই ফারাও 'আখেনাতোন' বা 'ইখনাটন' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি পুরোহিতদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। আখেনাতোনের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা টুটেনখামেন ফারাও হন। মিশরের শেষ ক্ষমতাশালী ফারাও ছিলেন দ্বিতীয় রামেশিস। তিনি ১২২৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মারা যান। তারপর থেকেই মিশর দুর্বল হয়ে পড়ে।

কিছুদিন আসিরিয়ার অধীনে থাকার পর মিশর আবার স্বাধীন হয়। পরবর্তী কালে মিশর পর পর পারস্য, গ্রীস ও রোমের অধীন হয়। প্রাচীন মিশরের শেষ রানীর নাম ক্লিওপেট্রা।

পুরোহিতদের ক্ষমতাঃ মিশরের লোক ছিল জাদুতে বিশ্বাসী। জাদুবিশ্বাসী লোকের ওপর পুরোহিতদের প্রভাব খুবই বেশি। পুজো, মন্ত্রতন্ত্র, নানা যাগযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পুরোহিতরাই মানুষের প্রার্থনা পৌঁছে দিতেন দেবতার কাছে। প্রাচীন যুগের সমাজে তাই পুরোহিতদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সাম্রাজ্যবিস্তারের যুগে মিশরের দেবমন্দিরগুলোর সম্পদ্ যতই ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে, পুরোহিতদের ক্ষমতা ও আর্থিক সচ্ছলতাও ততই বাড়তে থাকে। কোনো কোনো দেবমন্দিরের পুরোহিতরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। পুরোহিতরা জ্ঞানচর্চা করতেন। মন্দিরসংলগ্ন বিদ্যালয়ে তাঁরা জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাতেন। ফলে, জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব খুব কম ছিল না।

তবে ব্যাবিলনের পুরোহিতদের মতো মিশরীয় পুরোহিতরা কখনো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে পারেন নি। মিশরে ফারাও ছিলেন একাধারে দেবতা ও রাজা। জনসাধারণের কাছে দেবতা আমন-রা-এর পুত্র-রূপেই তিনি পরিচিত। তিনিই ছিলেন আবার প্রধান পুরোহিত। রাজপথে দেবমূর্তিকে নিয়ে উৎসবের যে-শোভাযাত্রা বেরোত, তার পুরোভাগে থাকতেন ফারাও। পুরোহিতরাই ফারাওয়ের দেবত্বকে জনসমক্ষে প্রচার করতেন। মিশরের পুরোহিতরা ছিলেন রাজতন্ত্রের একটি আবশ্যিক অঙ্গ। এক সময়ে আমনের পুরোহিতরা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। চতুর্থ আমেনহোতেপ তাঁদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্যে ঘোষণা করলেন যে, আতোনই হচ্ছেন একমাত্র আরাধ্য দেবতা। এই দেবতার প্রতীক ছিল সূর্য। প্রজাদের তিনি আতোনের পুজো করতে বললেন। তাঁর নতুন ধর্মকে আমনের পুরোহিতদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি থিবস্ থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন আমার্ণায়। ফারাও নিজের নামটিও পরিবর্তন করে নতুন 'আখেনাতোন' বা ইখ্‌নাটন (অর্থাৎ, যে আতোনকে সুখী করে) নামটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু আখেনাতোনের মৃত্যুর পরেই (১৩৫৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে) আবার আমনের পুরোহিতরা তাঁদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।

অনুশীলনী

১। কোন্ সময়কে মিশরের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ বলা হয় ?
২। প্রথম আমোসে কে ? তাঁর সম্বন্ধে কী জান ?
৩। প্রথম থুথমোস কী করেছিলেন ?
৪। তৃতীয় থুথমোসের কৃতিত্ব-সম্বন্ধে কী জান ?
৫। সাম্রাজ্য-বিস্তারের ফলে মিশরের কী কী লাভ হয়েছিল ?
৬। মিশরে পুরোহিতদের ক্ষমতা কিরূপ ছিল ?
৭। আখেনাতোন কে ? তাঁর সম্বন্ধে কী জান ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইরান

পারস্যের উত্থান ঃ আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের পশ্চিমে যে দেশটি, তার নাম ইরান। প্রাচীনকালে আর্যদের একটি শাখা ইরানে বসতি স্থাপন করে। পরে মীড নামে একটি জাতি ইরান অধিকার করে। এক সময়ে মীডরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের এক রাজা আসিরীয়দের পরাজিত করে রাজধানী নিনেভে ধ্বংস করেছিলেন। এসময়ে পারস্যও ছিল মীড-সাম্রাজ্যের অধীন। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের আন্শান্ প্রদেশের শাসনকর্তা সাইরাস মীড-রাজা এ্যাস্টায়েজেসকে সিংহাসনচ্যুত করেন। এ সময় থেকেই মীডিয়া পারস্যের অধীন হয়। পারসিকদের নাম অনুসারেই প্রাচীন ইরানের নাম হয় পারস্য। এই পারস্যই এক সময়ে সমগ্র এশিয়া মাইনর এবং আরও অনেক দেশ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। পারসিকদের আগে আর কেউ এত বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে নি।

সাইরাস পারস্যে আখমেনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (৫৬০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের আগে সাইরাসের মতো এত বড়ো দিগ্বিজয়ী বীর আর ছিল না। তিনি আসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, লিডিয়া এবং এশিয়া মাইনর জয় করে সিন্ধুনদের তীর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সাইরাস

পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে নানা ধর্মমতের লোক বাস করত। তিনি কারুর ধর্মাচরণে বাধা দিতেন না। ৫৩০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সাইরাসের মৃত্যু হয়। সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বাইসেস মিশরকে পারস্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দারায়ুসকে পারস্য-সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। তিনি ৫২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বেহিস্তান নামে একটি জায়গায় সম্রাট দারায়ুসের একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। লিপিতে পারসিক, আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় এই তিনটি ভাষায় দারায়ুসের রাজ্য-জয়ের গৌরবময় কাহিনী খোদাই করে রাখা হয়েছে। সিন্ধুনদের পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম ভারত ছিল পারস্য-সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। পারস্য-সম্রাট এখান থেকে প্রতিবৎসর ৪৬৮০ ট্যালেণ্ট কর হিসেবে আদায় করতেন। এত বেশি পরিমাণ অর্থ কর হিসেবে আর কোনও প্রদেশ থেকেই পাওয়া যেত না। দারায়ুস একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেছিলেন। তাঁর নৌ-সেনাপতি স্কাইলাক্স সিন্ধুনদের তীর থেকে সুয়েজ উপসাগর পর্যন্ত জলপথ জরিপ করিয়েছিলেন। রাশিয়ার ভল্‌গা নদী পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। শেষজীবনে দিগ্বিজয়ের বাসনায় তিনি গ্রীস আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে, গ্রীস আক্রমণ করার ইচ্ছা দারায়ুসের আদৌ ছিল না। তিনি সিথিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ্যাটোসা নামে তাঁর এক রানী নাকি সম্রাটকে বলেছিলেন, "আমি গ্রীস দেশের মেয়েদের দাসীরূপে চাই।" রানীকে খুশি করার জন্যে দারায়ুস গ্রীস আক্রমণ করেন। দারায়ুসের গ্রীস অভিযানের প্রধান কারণ অন্য। তিনি গ্রীকদের ওপর কোনদিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তা ছাড়া, গ্রীস জয় করতে না পারলে ইয়োরোপ পর্যন্ত তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা কেমন করে প্রসারিত করবেন।

যাই হোক, দারায়ুসের গ্রীস অভিযান সফল হয় নি। ম্যারাথনের যুদ্ধে অল্পসংখ্যক গ্রীক সৈন্যের কাছে তাঁর বিশাল বাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে গ্রীকদের সেনাপতি ছিলেন মিলটিয়াডিস্ নামে এথেন্সের একজন নাগরিক। পারসিকরা কিন্তু পরাজয়ের এই অপমান ভুলতে পারল না। ইতিমধ্যে দারায়ুসের মৃত্যু (৪৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে) হলে

তাঁর পুত্র জেরাকসেস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আবার গ্রীস আক্রমণ করলেন। থার্মোপাইলি নামে একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথে স্পার্টার লিওনিডাসের নেতৃত্বে অল্পসংখ্যক গ্রীক সৈন্য পারসিক বাহিনীর গতি রোধ করল। লিওনিডাস এবং তাঁর সাহসী অনুচরগণ যুদ্ধ করতে করতে বীরের মতো প্রাণ দিলেন। পঁচাত্তর হাজার পারসিক সৈন্যের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব ছিল না। পারসিকরা এথেন্সে প্রবেশ করে নগরটি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এর পরেও গ্রীসের সঙ্গে পারসিকদের একটি বড় রকমের জলযুদ্ধ হয়। সালামিস দ্বীপের প্রণালীতে গ্রীক নৌবাহিনী পারসিক নৌবাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে। এর পরে পারসিকরা আর কখনও গ্রীসে প্রবেশ করে নি। খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়ুসকে পরাজিত করে পারস্যকে গ্রীক-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

জরথুস্ত্রের কথা ঃ বৈদিক আর্যদের মতো ইরানীরাও বহু দেবতার পুজো করত ; তারা জীবজন্তু ও পিতৃপুরুষেরও পুজো করত। এইসব দেব-দেবীর মধ্যে ছিলেন সূর্যদেবতা মিথ্র, পৃথিবীর দেবী অনায়িতা এবং ষাঁড়-দেবতা হেওমা। আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে প্রাচীন ইরানীদের মধ্যে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এঁর নাম জরথুস্ত্র। জরথুস্ত্রের মৃত্যুর পর তাঁর উপদেশ ও বাণী যে-গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে, তার নাম 'আবেস্তা'। আমাদের কাছে বেদ যেমন পবিত্র গ্রন্থ, ইরানীদের কাছে আবেস্তাও তেমনি পবিত্র। বৈদিক স্তোত্রের মতো আবেস্তার স্তোত্রগুলিও খুব সুন্দর।

জরথুস্ত্রের ধর্মের মূলকথা খুব সহজ। জগতে ভালো আর মন্দ, আলো এবং অন্ধকার, সু এবং কু এই দু'রকম শক্তি আছে। একটি শক্তি মানুষের কল্যাণ সাধন করে, অপরটি হচ্ছে অকল্যাণের, অমঙ্গলের শক্তি। এই দু'রকম শক্তির মধ্যে অহরহ সংগ্রাম চলছে। জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হলেন কল্যাণের শক্তি, আলোর দেবতা। তার নাম আহুর-মজদা। আর অকল্যাণের, কপটতার, অন্ধকারের দেবতার নাম অহিমান। অহিমানের সঙ্গে আহুর-মজদার সর্বদাই দ্বন্দ্ব চলছে। মানুষ যদি ন্যায়ের পথে থাকে, সদাচরণ করে, অসত্য

না বলে, তা হলে আহুর-মজদারই পুজো করা হয়। এতে পৃথিবীর কল্যাণ হয়। জরথুস্ত্রের মতে ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আর অবিশ্বাস হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো পাপ। মানুষের তিন প্রকারের কর্তব্য আছে: যথা, শত্রুকে মিত্র করা, দুষ্টকে সৎপথে নিয়ে আসা এবং অজ্ঞকে জ্ঞান দান করা। আলো'র দেবতা মিথ্র হলেন আহুর-মজদার সহায়। বেদেও 'মিত্র' নামে দেবতার উল্লেখ আছে। পার্শীরা অগ্নির উপাসনা করে না; তারা অগ্নিকে পবিত্র বলে মনে করে। অগ্নি হোল আলোকের এবং কল্যাণের উৎস। সেজন্যে তারা সব সময়েই আগুন জ্বালিয়ে রাখত, কখনও নিবতে দিত না। প্রাচীন গ্রীসে, প্রাচীন রোমে এবং আমাদের দেশে আগুনকে অনির্বাণ রাখার এই প্রথা ছিল। পার্শীরা মৃতদেহ দাহ বা সমাহিত না করে লোকালয় থেকে দূরে কোনও খোলা জায়গায় রেখে দেয়, যাতে পশুপাখিরা শবদেহ খেয়ে ফেলতে পারে।

পারস্য সম্রাট দারায়ুস (১ম) শুধু জরথুস্ত্রের ধর্মই গ্রহণ করেন নি, তিনি একে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন। সাসানীয় রাজাদের আমলেও পারস্যে জরথুস্ত্রের ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে তাতারদের আক্রমণের ফলে এই ধর্ম পারস্য থেকে একেবারেই লোপ পায়। তবে ভারতবর্ষে যে-অল্পসংখ্যক পার্শী বাস করেন, তাঁরা জরথুস্ত্রের ধর্মের নিয়মকানুন আজও মেনে চলেন।

অনুশীলনী

১। ইরানের প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধে কী জান?
২। সাইরাস কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?
৩। সম্রাট দারায়ুসের লিপিটি কোথায় পাওয়া গেছে? লিপিটিতে কী লেখা আছে?
৪। দারায়ুসের গ্রীস অভিযান-সম্বন্ধে কী জান?
৫। জরথুস্ত্র কে? তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন?
৬। জরথুরেস্ত্র ধর্মের মূল কথা কী?

৭। নিচের বাক্যগুলোতে শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — নাম অনুসারে প্রাচীন ইরানের নাম হয় পারস্য। (খ) — পরাজিত শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। (গ) পারস্য সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন —। (ঘ) অন্ধকারের দেবতার নাম —। (ঙ) পার্শীরা — উপাসনা করে না ; তারা — পবিত্র বলে মনে করে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহুদিদের রাজ্য

এবার তোমাদের ইহুদি জাতির কথা বলব। তোমরা খ্রীস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের নাম নিশ্চয়ই জান। বাইবেলের ওল্ড্ টেস্টামেণ্টে ইহুদিদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে।

হিকসসদের মতো ইহুদিরাও পশ্চিম এশিয়ার সেমিটিক যাযাবর জাতির একটি শাখা। এরা প্রথমে মেষপালকের সরল যাযাবর জীবন যাপন করত। পরে (ইহুদিদের মতে, ২২০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে) তারা জুডা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। এই জুডা রাজ্যটি ছিল প্যালেস্টাইনে।

মিশরে ইহুদিদের প্রবেশ : ইহুদিরা কিন্তু তাদের মাতৃভূমিতে বেশিদিন বসবাস করতে পারে নি। মিশর, ব্যাবিলোনিয়া প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাজ্যগুলোর লোভের শিকার হয়ে তারা বার বার আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তাদের দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

কারো কারো মতে, তারা ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মিশরে প্রবেশ করে। সম্ভবত, জীবিকার অন্বেষণেই তারা মিশরে গিয়েছিল। সেখানে কিছুকাল বসবাস করার পরে হিকসসরা মিশর অধিকার করে। হিকসসরা ছিল ইহুদিদেরই একরকম জ্ঞাতি, যাযাবর সেমিটিক জাতির আর একটি শাখা। সুতরাং, মিশরে হিকসসদের আধিপত্য তাদের কাম্য ছিল। যতদিন হিকসসরা মিশর শাসন করেছে, ইহুদিরা ততদিন মোটামুটি সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করেছে। কিন্তু মিশরের রাজা আমোসে মিশর থেকে হিকসসদের তাড়িয়ে দেবার পর থেকেই মিশরে ইহুদিদের দুর্ভাগ্যের

শুরু হয়। হিকসসদের সঙ্গে ইহুদিদের সম্প্রীতির কথা ফারাওয়ের অবিদিত ছিল না। তিনি এবার ইহুদিদের ওপর তার প্রতিশোধ নিলেন। ইহুদিমাত্রকে ক্রীতদাসে পরিণত করে তাদের দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ করাতে লাগলেন। এভাবে ইহুদিদের ওপর চলল অত্যাচার আর নির্যাতন। ইহুদিদের সংখ্যাও এক সময়ে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। মিশরের ফারাও নাকি এই জনবল-বৃদ্ধিতে খুব ভয় পেয়ে তাদের ওপর নির্যাতন শুরু করেছিলেন। যাই হোক, তিনশো বছরের বেশি কাল ইহুদিদের এরকম দুঃখের জীবন কাটে।

মিশর থেকে প্রস্থান ঃ এবার তোমাদের ঈশ্বর বা জেহোবার দূত মোজেসের কথা বলব। মোজেস বা মুসাকে ইহুদিরা ঈশ্বরের দূত বলেই মনে করে। কথিত আছে, জেহোবার আদেশে মোজেস ইহুদিদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি চাইতে গেলে ফারাও প্রথমে অসম্মতি জানান, কিন্তু পরে তিনি সম্মত হন। মোজেস ইহুদিদের নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হয়ে ভাবতে লাগলেন কেমন করে সমুদ্র পার হবেন। হঠাৎ তিনি জেহোবার আদেশ শুনতে পেয়ে তাঁর হাতের লাঠিখানা সমুদ্রের জলের ওপর রাখলেন। মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্রের জল দু-পাশে সরে গিয়ে ইহুদিদের পথ করে দিল। তারা হেঁটে হেঁটে সমুদ্র পার হয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল ফারাও সৈন্যসামন্ত নিয়ে সমুদ্রের তীরে এসে হাজির হয়েছেন। ইহুদিদের পেছনে তিনিও সসৈন্যে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। জেহোবার আদেশে এবার মোজেস জলের ওপর তাঁর হাতখানা রাখতেই কল কল শব্দে দু-পাশ থেকে জল ছুটে এসে পথ নিশ্চিহ্ন করে দিল। ফারাও তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সলিল-সমাধি লাভ করলেন। ততক্ষণে মোজেস ইহুদিদের নিয়ে নিরাপদেই সমুদ্রের অপর তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। মিশর থেকে ইহুদিদের চলে আসাকে বলা হয় প্রস্থান (বা Exodus)। ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইহুদিরা এক চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল। ইহুদিদের নিয়ে মোজেস সিনাই মরুভূমিতে প্রবেশ করলেন। তিনি সিনাই পর্বতে কিছুদিন থাকেন। এই সময়ে একদিন জেহোবা তাঁকে

দশটি আদেশ দিলেন। দশটি আদেশ হল : (১) আমি প্রভু এবং ঈশ্বর, (২) মূর্তিপুজো করবে না, (৩) ঈশ্বরের নামে শপথ করবে না, (৪) রবিবারকে পবিত্র মনে করবে, (৫) পিতামাতাকে সম্মান করবে, (৬) নরহত্যা করবে না, (৭) চুরি করবে না, (৮) স্ত্রীলোককে অসম্মান করবে না, (৯) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, (১০) প্রতিবেশীর কোন জিনিস বা সম্পত্তির প্রতি লোভ করবে না। মোজেস ইহুদিদর এই দশটি আদেশ শোনালেন। দীর্ঘকাল পরে নানা কষ্ট ভোগ করে অবশেষে একদিন ইহুদিরা গিয়ে ক্যানান বা প্যালেস্টাইনে উপস্থিত হোল। জেহোবা নাকি বহুকাল আগে তাদের এই স্থানটি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইনে পৌঁছাবার আগেই পথে মোজেসের মৃত্যু হয়।

প্রতিশ্রুত দেশে : পালেস্টাইনে থাকার সময়ে ইহুদিদের সঙ্গে ফিলিস্টাইনদের অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। ফিলিস্টাইনরা যুদ্ধবিদ্যায় ফিনিসীয়দের মতোই দক্ষ ছিল। তা ছাড়া তারা যুদ্ধে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। সে সময়ে ইহুদিদের রাজা ছিলেন সল, তিনি ফিলিস্টাইনদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারান। ইহুদিদের পরবর্তী রাজা ডেভিড ছিলেন প্রকৃতই বীর। তিনি ফিলিস্টাইনদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। তিনিই রাজধানী জেরুজালেমের প্রতিষ্ঠা করেন। সলের পুত্র সলোমন ছিলেন ইহুদিদের শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বিচারক হিসেবে তাঁর নাম আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি রাজধানী জেরুজালেমে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করান। ৯৩০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সলোমনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইহুদিদের রাজ্যটি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর খণ্ডটির নাম হয় ইজরায়েল। এই রাজ্যটির রাজধানীর নাম সামারিয়া। দক্ষিণ খণ্ডটি নিয়ে জুডা নামে একটি নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে। জুডার রাজধানীর নাম জেরুজালেম। ৭২১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে

সলোমন

আসিরিয়ার রাজা ৩য় সারগণ ইজরায়েল অধিকার করেন। ৫৮৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন-রাজ ২য় নেবুকাদনেজার জুডা দখল করেন। এরপর জেরুজালেম পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে রোমসম্রাট টাইগ্রাস জেরুজালেম দখল করেন।

হাজার হাজার বছর ধরে ইহুদিদের জীবন কেটেছে নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণে তারা বার বার লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে, কিন্তু তাদের জাতীয় ঐক্যবোধ কখনও নষ্ট হয় নি। ইহুদিরা ধর্মপ্রাণ জাতি। তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। অন্যান্য জাতি থেকে তাদের-যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে এটা তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। বোধ হয় এ কারণেই কোনো রাজনৈতিক বিপর্যয় তাদের জাতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট করতে পারে নি। পশ্চিমী সভ্যতায় তাদের যথেষ্ট অবদান আছে।

অনুশীলনী

১। মিশরে ইহুদিরা কখন প্রবেশ করে? সেখানে তারা কিরূপ জীবন যাপন করত?

২। মোজেস কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?

৩। মোজেসের নেতৃত্বে মিশর থেকে ইহুদিদের প্রস্থান—এ-বিষয়ে তুমি কী জান?

৪। ইহুদিদের সঙ্গে ফিলিস্টাইনদের যে-যুদ্ধবিগ্রহ হয়, সে বিষয়ে তুমি সংক্ষেপে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৫। জেহোবা কে? তিনি মোজেসকে যে-দশটি আদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কয়েকটি আদেশ লিখে দেখাও।

৬। সলোমন কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?

৭। ইহুদিদের জাতীয় ঐক্যবোধ নষ্ট হয় নি কেন?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) জুডা রাজ্য ছিল —। (খ) মিশর থেকে চলে আসাকে বলা হয় —। (গ) ফিলিস্টাইনরা যুদ্ধে — অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। (ঘ) জুডার রাজধানীর নাম —। (ঙ) রোমসম্রাট — জেরুজালেম দখল করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রীস

এখন তোমাদের যে-দেশটির কথা বলব, তার নাম গ্রীস। বর্তমান সভ্যতায় গ্রীসের অনেক দান আছে। আবার গ্রীক সভ্যতাও মিনোয়ানদের ধর্ম, শিল্প, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কাজেই মিনোয়ানদের কথা না জানলে গ্রীসের ইতিহাসকে পুরোপুরি জানা যাবে না।

ক্রীট দ্বীপের মিনোয়ান সভ্যতা ঃ গ্রীসের দক্ষিণে ঈজিয়ান উপসাগরের বুকে ক্রীট দ্বীপটি অবস্থিত। এখানে আজ থেকে কয়েক

হাজার বছর আগে মিনোয়ান সভ্যতার জন্ম হয়। মিশরের রাজাদের উপাধি ছিল ফারাও ; তেমনি ক্রীটের রাজার উপাধি ছিল মিনোস। মিনোসের নাম অনুসারেই ক্রীটের লোকদের বলা হয় মিনোয়ান এবং ক্রীটের সভ্যতাকে মিনোয়ান-সভ্যতা।

মিনোয়ানরা পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরি করত, সোনা-রূপো দিয়ে অলঙ্কার বানাত এবং সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি করত। পরে তারা অনেক নগর নির্মাণ করে। ২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ

থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর পর্যন্ত কালকে মিনোয়ান-সভ্যতার গৌরবের যুগ বলা যেতে পারে। এ সময়ে রাজধানী নসস্ ছাড়াও ফিস্টাস, হার্জিয়া, মোচ্‌লস্ প্রভৃতি নগর নির্মিত হয়। এ সময়েই মিনোয়ানরা বিশাল বিশাল প্রাসাদ এবং অনেক অট্টালিকা নির্মাণ করে। তারা এক রকমের অক্ষরও আবিষ্কার করেছিল। ক্রীটের শাসন-ব্যবস্থা ছিল খুবই উন্নত। হোমার তাঁর ইলিয়ড মহাকাব্যে ক্রীটের গুণগান করেছেন। ক্রীটের সম্পদ আর সৌন্দর্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ক্রীট রাজ্যে নাকি নব্বইটি শহর ছিল।

ঈজিয়ান উপসাগরের বাণিজ্যকে এক সময়ে ক্রীটের রাজা নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজা মিনোস মিশর, সিন্ধু উপত্যকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে অপরিমিত ধনরত্নের অধিকারী হয়েছিলেন। ঈজিয়ান উপসাগরের বহু দ্বীপ এবং এথেন্সের মতো গ্রীসের আরও কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে মিনোস একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। রাজা মিনোসকে নিয়ে গ্রীক সাহিত্যে অনেক গল্প রচিত হয়েছিল। একটি গল্প তোমরা অনেকেই পড়েছ। রাজা মিনোসের প্রাসাদের ভেতরে একটি গোপন সুড়ঙ্গ ছিল। সেখানে তিনি একটি অদ্ভুত জীব পুষতেন। জীবটির নাম মিনোটার। তার দেহটা ছিল মানুষের, আর মাথাটা ষাঁড়ের। মিনোটার মানুষের মাংস খেত। এক সময়ে এথেন্সে ঈজিয়াস নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ক্রীটের রাজা মিনোস এথেন্স নগরটি অবরোধ করেছিলেন। নগরবাসীদের অনুরোধে মিনোস এথেন্সকে ধ্বংস না করে তাদের ওপর একটা ভয়ঙ্কর শর্ত আরোপ করলেন। এই শর্ত অনুসারে, প্রতি বছর এথেন্সের সাত জন তরুণ আর সাত জন তরুণীকে ক্রীটে পাঠানো হোত। ঐ তরুণ-তরুণীদের মাংসে মিনোটার ভুরিভোজ করত। কিন্তু এক বছর এথেন্সের যুবরাজ থীসিয়াস নিজেই ক্রীটে গেলেন। ক্রীটের রাজকুমারী আরিয়াদ্‌নির সাহায্য নিয়ে একাই মিনোটারকে হত্যা করে তিনি এথেন্সের কলঙ্ক ঘোচালেন। গল্পটি পড়ে তোমাদের কি মনে হয় না যে, এক সময়ে এথেন্স ক্রীটের অধীনতা স্বীকার করেছিল?

নসসের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ থেকে মিনোয়ান-সভ্যতার

কথা জানা গেছে। প্রাসাদের ভেতরে অসংখ্য ঘর—কোনোটা স্নানের, কোনোটা রান্নার। প্রাসাদের ভেতরেই আবার দরবার-কক্ষ। জল-সরবরাহের ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক কালের মতো।

ক্রীটে একটি পুরোপুরি নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। কামার, কুমোর, ছুতোর, স্বাকরা, স্থপতি, ভাস্কর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কারিগর বিভিন্ন শিল্প গড়ে তুলেছিল। রাজপ্রাসাদ ছাড়াও রাজধানী নসসে পাথর আর ইট দিয়ে বহু অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়।

মিনোয়ানরা নাচ, গান ও আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করত। তারা ষাঁড়ের লড়াই দেখতে খুবই ভালবাসত। নারী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরত।

মিনোয়ানরা পাহাড়-পর্বত, গাছপালা, চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতির পুজো করত। তারা মাতৃদেবীরও পুজো করত। ষাঁড়কে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

খ্রীস্টপূর্ব ষোড়শ শতকে মাইসিনির গ্রীকরা এসে ক্রীট দখল করে। তারা নসসের রাজপ্রাসাদটি জ্বালিয়ে দেয়। মাইসিনীয়রা মিনোয়ানদের অনুকরণে পাইলস, টিরিন, এথেন্স প্রভৃতি নগর গড়ে তোলে। ঐসব নগরে তারা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাও নির্মাণ করে। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে একিয়ানরা মাইসিনির নগরগুলোতে লুঠপাট চালায়। এরা ক্রীট দ্বীপটি অধিকার করে। এরা ছিল গ্রীক জাতিরই একটি শাখা। একিয়ানরা কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যও গড়ে তুলেছিল। তার মধ্যে আর্গস ছিল একটি। এদের ওপরে ১১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে আক্রমণ আসে। আক্রমণকারীরা ছিল ডোরিয়ান গ্রীক। এরা ছিল অর্ধসভ্য। কিন্তু ধীরে ধীরে এরা বিজিতদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সভ্যতা গ্রহণ করে। এভাবে মিনোয়ান, মাইসিনীয়, একিয়ান ও ডোরিয়ানদের সংমিশ্রণে গ্রীক জাতি ও গ্রীক সভ্যতার জন্ম হয়।

হোমারের যুগে গ্রীস : মানচিত্রে গ্রীস দেশটিকে দেখতে পাবে ভূমধ্যসাগরের উত্তর-পূর্ব তীরে। বর্তমানে এই দেশটির উত্তর-পূর্বে আলবানিয়া, উত্তরে যুগোশ্লাভিয়া এবং উত্তর-পশ্চিমে বুলগেরিয়া। পূর্বদিকে গ্রীস এবং তুরস্কের মাঝখানে ঈজিয়ান উপসাগর। গ্রীস

দেশের অধিবাসীদের বলা হয় গ্রীক। ইয়োরোপীয় সভ্যতার জন্ম গ্রীসের মাটিতে।

প্রাচীনকালে অর্ধসভ্য গ্রীকরা বল্কান দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাস করত। তারা পশুপালন করত। বহুকাল আগে তারা গ্রীসে এসে উপস্থিত হয়। নতুন জায়গায় আসার পর পুরনো বাসিন্দাদের সঙ্গে গ্রীকদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। এরকম যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে ইলিয়ড ও ওডিসি নামে গ্রীকদের দু'খানি মহাকাব্য। গ্রীক কবি হোমার এই মহাকাব্য দুখানি রচনা করেন। হোমার অন্ধ ছিলেন।

হোমার

ইলিয়ডের কাহিনী ঃ আর্গসের রাজা এগামেমননের ভাই মেনিলাউস স্পার্টায় রাজত্ব করতেন। সে যুগে মেনিলাউসের রানী হেলেনের মতো সুন্দরী আর ছিল না। তখন এশিয়া মাইনরের উপকূলে ট্রয় নামে একটি সুন্দর রাজ্য ছিল। প্রিয়াম ছিলেন ট্রয়ের রাজা। একবার ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস স্পার্টায় এসে সুন্দরী হেলেনকে চুরি করে নিয়ে যান। এতে গ্রীকদের খুবই অপমান হয়। তারা রাজা এগামেমননের নেতৃত্বে ট্রয় আক্রমণ করে। ট্রয় নগরী ছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দীর্ঘ দশ বছর পরে কৌশল অবলম্বন করে গ্রীকরা নগরীতে প্রবেশ করে। এরপর ট্রয়ের পতন হয়। হেলেন তাঁর স্বামীর কাছে ফিরে যান। ট্রয়ের যুদ্ধে নেস্টর, একিলিস, ওডিসিয়ুস বা ইউলিসিস প্রভৃতি গ্রীকবীরেরা অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন।

ওডিসির কাহিনী ঃ গ্রীক বীর ওডিসিয়ুস বা ইউলিসিসের আশ্চর্য ভ্রমণ-কাহিনী নিয়েই 'ওডিসি' মহাকাব্যটি রচিত হয়েছিল। ওডিসিয়ুস ছিলেন ইথাকা রাজ্যের রাজা। ট্রয় যুদ্ধের পরে তিনি স্বদেশের দিকে রওয়ানা হন। পথে সমুদ্রে তাঁর জাহাজ ডুবে যায় ;

এর পর থেকে তিনি একটার পর একটা বিপদের সম্মুখীন হন। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবলে সব বিপদ কাটিয়ে উঠে তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর পর নিজের রাজ্যে ফিরে যান। তারপর নিজের সিংহাসন এবং স্ত্রী পেনিলোপকে শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করেন।

হোমারের যুগে গ্রীকদের জীবনযাত্রা : কৃষি ও পশুপালন ছিল সে যুগের গ্রীকদের প্রধান উপজীবিকা। প্রথমে তারা গ্রামেই বাস করত। পরে ছোট ছোট নগর গড়ে ওঠে এবং তারা নগরে বাস করতে থাকে। এক-একটা নগর নিয়ে গড়ে ওঠে আলাদা রাষ্ট্র। তখন রাজা ছিলেন বটে, তবে সমাজের আর দশজনের মতো তিনিও শ্রমের কাজ করতেন। তিনি ছিলেন নগরের প্রধান পুরোহিত এবং প্রধান বিচারকর্তা। আবার যুদ্ধের সময় তিনিই সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করতেন। গ্রীকরা ডাকাতি ও লুঠতরাজ করে বিদেশ থেকে ধন-সম্পত্তি নিয়ে আসত, লোকজনও ধরে আনত। তারপর তাদের হাটে-বাজারে বেচে দিত, অথবা বাড়িতে ক্রীতদাস করে রাখত। যাঁদের প্রচুর জমিজমা ছিল, তাঁরাই ছিলেন সম্ভ্রান্ত। শাসনক্ষমতাও ছিল তাঁদেরই হাতে। তাঁদের নিচে ছিল স্বাধীন নাগরিক, স্বাধীন শ্রমিক প্রভৃতি। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। সকলের নিচে ছিল অসংখ্য ক্রীতদাস। চাষের কাজ, নানা রকম শিল্পের কাজ ক্রীতদাসরাই করত।

গ্রীক সমাজ গড়ে উঠেছিল পরিবারকে কেন্দ্র করে, আর পরিবারের কর্তাই ছিলেন সর্বেসর্বা। পরিবারের আর সকলে কর্তার হুকুম মেনে চলত। মেয়েরা চরকা কাটত, তাঁত বুনত, সেলাই করত।

গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী : গ্রীকরা বিশ্বাস করত যে, তারা আদিপুরুষ ডিউক্যালিয়নের পুত্র হেলেনের বংশধর ; এজন্যে তারা 'হেলেনীজ' বলে নিজেদের পরিচয় দিত আর নিজেদের দেশকে বলত হেলাস। গ্রীকরা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করত। ওলিম্পাস নামে এক পাহাড়ের চূড়ায় তাদের দেবদেবীরা নাকি বাস করতেন।

দেবতাদের রাজা ছিলেন জিউস ; অ্যাপোলো তাঁর ছেলে আর এথেনা মেয়ে। জিউসের স্ত্রীর আর একটি মেয়ে আর্টেমিস ছিলেন শিকারের দেবী। অ্যাপোলো সূর্যের দেবতা, আবার গীতবাদ্য এবং শিল্পকলায়ও তিনি দক্ষ। বর্তমান, অতীত আর ভবিষ্যৎ—এই তিন কালে এমন কিছু নেই যা তাঁর অজানা। প্রাচীনকালে গ্রীকরা ভবিষ্যৎ জানার জন্যে দলে দলে ডেলফি নগরে দেবতা অ্যাপোলোর মন্দিরে গিয়ে ধরনা দিত। এথেনা একাধারে জ্ঞান ও যুদ্ধের দেবী। গ্রীসের

অ্যাপোলো আর্টেমিস

এথেনা পসিডন

বর্তমান রাজধানী এথেন্স নামটি এসেছে এথেনার নাম থেকে। দেবরাজ জিউসের এক ভাই পসিডন হলেন সাগরের অধিপতি; অন্যজন হেড্‌স্‌ হলেন পাতালের রাজা। হার্মে হলেন দেবতাদের দূত। গ্রীকরা যাগযজ্ঞ করত। দেবতাকে খুশি করার জন্যে তারা পশুবলিও দিত।

গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র ঃ ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, গ্রীস দেশের চেহারাটাই কেমন যেন ভাঙাচোরা, এবড়ো-খেবড়ো। পাহাড় আর সমুদ্র দেশটিকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে। তাই প্রাচীন-কাল থেকেই এক-একটি খণ্ড নিয়ে এক-একটি রাজ্য গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি রাজ্যই আলাদা; রাষ্ট্রের গঠনও ছিল আলাদা। এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ, থিবস্‌ প্রভৃতি রাজ্যের ইতিহাসই হোল গ্রীসের ইতিহাস। এরকম একটা অবস্থায় সাধারণত যা ঘটে থাকে, গ্রীসেও তাই ঘটেছিল। রাজ্যগুলোর মধ্যে সদ্ভাব তো ছিলই না, ছিল বরং রেষারেষি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রায়ই এই রেষারেষি নিয়ে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ হোত। নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোথাও ছিল রাজার শাসন, আবার কোথাও ছিল সাধারণতন্ত্র, অর্থাৎ জনগণের শাসন। রাজার শাসনও যেখানে ছিল, সেখানে রাজা দুটি উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য শাসন করতেন।

গ্রীক উপনিবেশ ঃ গ্রীসের প্রধান ভূখণ্ডে ছোট ছোট নগরে একটা সময়ে জনসংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। নগরের সীমানার মধ্যে বাড়তি লোকের স্থান সঙ্কুলান হোত না। তা ছাড়া, যেসব নগরে অভিজাতদের শাসন ছিল, সেখানে স্বাধীন নাগরিক, কারিগর প্রভৃতি সুবিচার পেত না। অভিজাতরা নিজেদের স্বার্থে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, আইন প্রয়োগ করতেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কোনও ফল হোত না। বাড়তি লোকের কর্ম-সংস্থানের কোনো ব্যবস্থাও ছিল না। স্বাধীন নাগরিক ও কারিগরদের মধ্যে অনেকেই ঋণের দায়ে মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছিল। এসব কারণে গ্রীসের বিভিন্ন নগর থেকে দলে দলে লোক নতুন নতুন উপনিবেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। এর ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই আফ্রিকা থেকে থ্রেস এবং জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে

কৃষ্ণসাগরের পূর্ব-সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাইজেন্টিয়াম, সাইরাকিউস, স্যামোস, প্রিয়েন, এফেসাস, সিয়োস, নেক্সোস, মাইলেটাস এবং এমনি আরো বহু উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এইসব উপনিবেশগুলোতে গ্রীসের বহু জ্ঞানীগুণী লোক জন্মগ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী থেল্সের জন্মভূমি মাইলেটাস এবং দার্শনিক হেরাক্লিটাসের জন্ম হয়েছিল এফেসাসে। করিন্থের অধিবাসীরা সিসিলির সাইরাকিউসে একটি উপনিবেশ গড়েছিল। গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস এখানে জন্মগ্রহণ করেন (খ্রীস্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে)।

গ্রীকরা যে-নগরে বাস করত, সেই নগরের অনুকরণে তাদের নতুন উপনিবেশটি গড়ে তুলত। কেবল আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয়, এমন কি, শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঔপনিবেশিকরা তাদের পুরনো সংস্কৃতিকে বজায় রেখে চলত। প্রথম দিকে পুরনো নগর থেকেই তাদের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসত। পরে গ্রীকরা তাদের উপনিবেশগুলোতে নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলে। উপনিবেশগুলোর বাজারে গ্রীসে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর্থিক দিক দিয়ে গ্রীস খুবই লাভবান হয়। এথেন্সের পাথুরে জমিতে তেমন ফসল ফলত না। এথেন্সকে বরাবরই খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানি করতে হোত। শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। গ্রীক উপনিবেশগুলো গড়ে ওঠার পর থেকে এ-দুটি অভাব মিটে যায়। ঔপনিবেশিকরা ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি প্রভৃতি সব কিছুরই মধ্য দিয়ে তাদের মাতৃভূমি গ্রীসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছিল।

এখন তোমাদের গ্রীসের যে-দুটি নগর-রাষ্ট্রের কথা বলব, তাদের একটির নাম এথেন্স, অপরটির নাম স্পার্টা। গ্রীক সভ্যতায় এ-দুটি নগরের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এথেন্স : একটা মস্ত বড়ো ঢিবির পাদদেশ ঘিরে প্রাচীন এথেন্স নগরটি গড়ে উঠেছিল। গ্রীকরা ঐ ঢিবিটাকে বলত অ্যাক্রোপোলিস। গ্রীকরা অ্যাক্রোপোলিসের চূড়ায় নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী এথেনার একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেছিল।

রাজনৈতিক জীবন : এথেন্সে বড়ো বড়ো জমিদার বা

অভিজাতদের শাসনে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এথেন্সে তখন নয় জন আর্কন শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। সে সময়ে স্বাধীন শ্রমিক এবং কারিগরদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। বহু শ্রমিক, কৃষক এবং কারিগর মহাজনদের দেনার দায়ে ক্রীতদাসের জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ৬২০ খ্রীস্টাব্দে ড্র্যাকো নামে এক জন আর্কন পুরনো আইনের সংস্কার এবং কিছু কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেন। ড্র্যাকোর আইন কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই কঠোর ছিল। একটা বাঁধাকপি চুরি করার শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড। এ ধরনের আইন কার্যত প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। ড্র্যাকোর আইনে খেটে খাওয়া গরীব মানুষের কোনো সুবিধে হয় নি। ৫৯৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সোলন নামে অভিজাতবংশীয় এক ব্যক্তিকে আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়। সোলন আইন করে দেনার দায় থেকে সব মানুষকে মুক্তি দিলেন; সব বন্ধকী জমিও তিনি ছাড়িয়ে দিলেন। আগের থেকে বেশি সংখ্যক নাগরিককে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হোল। সোলনই প্রথম জুরীদের বেতন দেবার ব্যবস্থা করেন। সোলনের পরে এথেন্সবাসীরা পিসিস্ট্রেটাস নামে এক ব্যক্তিকে শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা দান করে। পিসিস্ট্রেটাস প্রায় কুড়ি বছর এথেন্স শাসন করেন। এথেন্সে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্লিসথিনিস নামে অভিজাতবংশীয় একটি লোক (৫০৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)। তিনি ৫০০ জন সভ্যের একটি কাউন্সিলের ওপর এথেন্স শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। জনসাধারণ এই প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করত। কাউন্সিলের নির্দেশ অনুযায়ী আর্কনরা শাসনের কাজ চালাতেন। জনসাধারণের মধ্য থেকে দশজন লোককে সেনাপতি হিসেবে নির্বাচিত করা হোত। ক্লিসথিনিসের আমল থেকেই নাগরিকেরা আগের তুলনায় শাসনের কাজে বেশি অংশগ্রহণ করতে থাকে। পরবর্তী কালে পেরিক্লিসের আমলে এথেন্সে গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের এথেন্সের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা হোল। এখন শোন এথেন্সবাসীদের সমাজ-জীবনের কথা।

সমাজ-জীবন ঃ এথেন্সের ছাত্ররা ছয় বছর থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত পেশাদার শিক্ষকদের কাছে ইতিহাস, কাব্য, গান-বাজনা,

ছবি আঁকা প্রভৃতি শিখত। একজন শিক্ষকই সব বিষয় পড়াতেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম ব্যায়াম ও শরীর চর্চারও ব্যবস্থা ছিল। কোনে কোনো শিক্ষক এথেন্স নগরের পথে পথে ঘুরে তরুণদের নানা শাস্ত্রের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। ষোল বছর বয়স পূর্ণ হলে ছাত্ররা শিবিরে গিয়ে জিমন্যাস্টিক শিখত; শত্রুর আক্রমণ থেকে নগরকে রক্ষা করার নানা রকম কৌশলও আয়ত্ত করত। মেয়েরা বাড়িতে মায়ের কাছে সুতো কাটা, কাপড় বোনা, নানা রকম নক্‌শার কাজ এবং গান-বাজনা শিখত। তেইশ বছর বয়স হলেই এথেন্সের তরুণদের নাগরিক বলে গণ্য করা হোত।

এথেন্সের নাগরিক জীবন ছিল খুবই সরল। পুরুষরা বেশির ভাগ সময়ই রাস্তায়, হাটে-বাজারে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করে কাটাত। রাজনীতি, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে তারা বেশ আনন্দ পেত। বিকেলে লোকসভায় গিয়ে তারা রাজনীতি অথবা বিচারের কাজ করত। এসব কাজ করার জন্যে তাদের যথেষ্ট অবসরও ছিল, কারণ সংসারের সব শ্রমের কাজই করত ক্রীতদাসরা। এভাবে কাজ ও নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও আলোচনার মধ্যে দিন কাটত বলেই এথেন্সবাসীদের দেহ ও মন দুয়েরই বিকাশ ঘটেছিল।

স্পার্টা: মধ্য গ্রীসে যেমন এথেন্সের সমকক্ষ কেউ ছিল না, দক্ষিণ গ্রীসেও তেমনি ছিল স্পার্টা।

রাজনৈতিক জীবন: স্পার্টার অধিবাসীদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নানা রকম আইন প্রণয়ন করেছিলেন যিনি, তাঁর নাম লাইকারগাস। তিনি ছিলেন স্পার্টার রাজা চারিলাউসের অভিভাবক ও আত্মীয়। শোনা যায়, লাইকারগাস ক্রীটের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাকি স্পার্টার জন্য নানাবিধ আইন রচনা করেন। স্পার্টায় একসঙ্গে দু'জন রাজা রাজত্ব করতেন। শাসনকার্যে রাজাকে পরামর্শ দিতেন দুটি উপদেষ্টা পরিষদ। 'জেরুসিয়া' (Gerousia) বা 'সিনেট' ছিল বয়োবৃদ্ধদের। দ্বিতীয় পরিষদটিকে বলা হোত 'এ্যাপেলা'। তিরিশ বছর বয়স্ক স্পার্টার যে-কোনো নাগরিক 'এ্যাপেলা'র সদস্য হতে পারতেন। এ্যাপেলার

সম্মতি ছাড়া আইন পাশ করা যেত না। পারসিকদের আক্রমণের পর থেকেই রাজার ক্ষমতা কমতে থাকে; পাঁচজন নির্বাচিত ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে শাসন-ক্ষমতা চলে যায়। এঁদের বলা হোত এফর। এঁরাই আইন নিয়ে যতকিছু বিবাদ-বিতর্কের মীমাংসা করতেন, যুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করতেন এবং প্রয়োজনবোধে শাসন-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে রাজাকেও নির্দেশ দিতেন।

সমাজ-জীবন ঃ স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এথেন্সের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লাইকারগাসের আইন রচনার ফলে স্পার্টা রীতিমতো একটি যুদ্ধ-শিবিরে পরিণত হয়েছিল। স্পার্টানরা যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হওয়াকে জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ বলে মনে করত। স্পার্টায় সাত বছর বয়স থেকেই বালকদের শিক্ষার দায়িত্ব নিতেন সরকার। ঐ সময় থেকেই সেনানিবাসে তাদের সামরিক শিক্ষা আরম্ভ হোত। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সব সময়েই ঘরের বাইরে খড়ের বিছানায় শুয়ে তাদের ঘুমোতে হোত। বছরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল তাদের বরাদ্দ। পায়ে জুতোর কোনও বালাই ছিল না। তাদের বরাদ্দ খাবারের পরিমাণও ছিল খুব কম। স্পার্টান তরুণরা সবরকম খিদে-তেষ্টা এবং দুঃখকষ্ট মুখ বুজে সহ্য করার শিক্ষালাভ করত। ত্রিশ বছর বয়স হলে ছেলেরা এবং কুড়ি বছর বয়স হলে মেয়েরা বিয়ে করতে পারত। দৌড়-ঝাঁপ, নাচ, কুস্তি প্রভৃতি করে মেয়েদের দেহও সবল রাখতে হোত। স্পার্টায় বিকলাঙ্গ বা রুগ্ণ শিশু জন্মালে তাকে মেরে ফেলা হোত। এরকম শিক্ষার ফলে স্পার্টার নাগরিকরা সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু সৈনিক হতে পেরেছিল। এক সময় সমগ্র গ্রীসের ওপরে স্পার্টা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু গ্রীসের শিক্ষাদীক্ষা ও শিল্পচর্চায় যা-কিছু দান, তা এথেন্সেরই, স্পার্টার নয়।

গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ—এই নিয়ে রেষারেষির অন্ত ছিল না। এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে এই রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ হয়। এখন তোমাদের সেই বিষয়ে কিছু বলব।

এথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার সংঘর্ষ ঃ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পেরিক্লিসের আমলে এথেন্স নৌবলে খুবই বলীয়ান হয়ে ওঠে।

পেরিক্লিস এথেন্সের নেতৃত্বে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। স্পার্টার নৌবল তেমন ছিল না, তবে স্থলযুদ্ধে তার সঙ্গে এথেন্স পেরে উঠত না। এথেন্সের শক্তিবৃদ্ধি স্পার্টা খুব সুনজরে দেখে নি, শেষ পর্যন্ত করিন্থের দুটি উপনিবেশ কর্কিরা এবং পটিডিয়াকে কেন্দ্র করে স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ বাধে (৪৩১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)। প্রায় সাতাশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। ৪০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের শেষ হয়। এই যুদ্ধ পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ নামে খ্যাত। পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধের পর সমগ্র গ্রীসের ওপর স্পার্টার আধিপত্য স্থাপিত হয়। ৩৩৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা ফিলিপ সমগ্র গ্রীস অধিকার করেন। ফিলিপের পুত্র দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার কেমন করে গ্রীসের সভ্যতাকে এশিয়া ও ইয়োরোপের দিকে দিকে প্রসারিত করেন, সে কথা তোমরা পরে শুনবে। এখন তোমাদের বলব সেই এথেন্সের কথা, যে-এথেন্স পেরিক্লিসের আমলে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল।

এথেন্সের গৌরবময় যুগ : পেরিক্লিসের সময়ে (৪৬১ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ৪২৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি চিন্তার নানা ক্ষেত্রে এথেন্সবাসীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দান করে। এজন্যে এই কালটিকে বলা হয় গ্রীসের স্বর্ণ যুগ।

পেরিক্লিস

পেরিক্লিস : পেরিক্লিসের পিতা জ্যান্থিপাস সালামিসের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ম্যারাথনের যুদ্ধের প্রায় তিন বছর আগে পেরিক্লিসের জন্ম হয়। তিনি ৩০ বছরেরও বেশি সময় এথেন্সের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারতেন। তিনি এথেন্সের আভ্যন্তরীণ শাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র গ্রীসের মধ্যে এথেন্স নৌশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাকে পেরিক্লিস যথাসম্ভব বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এথেন্সে বহু নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছিলেন। এথেনা দেবীর মন্দিরটি পারসিকদের আক্রমণের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করে

পার্থেনন

সেকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াসকে দিয়ে এথেনা দেবীর মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করান। এই মন্দিরের নাম পার্থেনন।

শিল্প : এথেনা দেবীর মূর্তিটি গড়া হয়েছিল হাতির দাঁত দিয়ে ; দেবীর বসন ছিল সোনার। ফিডিয়াস এথেনা দেবীর আরও একটি মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন ব্রোঞ্জ দিয়ে। মন্দিরের মধ্যে মূর্তিটিকে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যে, সমুদ্রপথে বহুদূর থেকে মূর্তিটি দেখা যেত। ফিডিয়াস দেবরাজ জিউসের যে-মূর্তিটি নির্মাণ করেছিলেন তা-ও একটি অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তি। পেরিক্লিস ক্যালিক্রেটিস এবং ইক্টিনাস নামে দুজন শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এথেন্সে বহু নতুন নতুন অট্টালিকা, মন্দির ও তোরণ নির্মাণ করান।

সাহিত্য : শিল্পের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পেরিক্লিসের আমলের এথেন্স তার প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছে। এস্কাইলাস, সোফোক্লিস, ইউরিপিডিস, এরিস্টোফিনিস প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যকারেরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলো এ যুগেই রচনা করেন। এঁদের প্রথম তিনজন বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন। এস্কাইলাসের বয়স যখন মাত্র ২৭ বছর তখন তাঁর প্রথম নাটক

প্রকাশিত হয়। ৪১ বছর বয়সে তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান লাভ করেন।

৪৬৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন যিনি, তাঁর নাম সোফোক্লিস। সোফোক্লিসের বয়স তখনমাত্র পঁচিশ বছর। এথেন্সের উপকণ্ঠে কলোনাস নামে একটি জায়গায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন পেরিক্লিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি বিভিন্ন সময়ে এথেন্সের শাসনকার্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মোট ১১৩ খানা নাটক লেখেন। ৪০৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সোফোক্লিসের মৃত্যু হয়।

ইউরিপিডিসের লেখা ৭৫ খানা নাটকের মধ্যে মাত্র ১৮ খানা পাওয়া গেছে। এরিস্টোফিনিস কমেডি বা প্রহসন রচনা করেন।

ইতিহাস ঃ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এথেন্সবাসীরা পিছিয়ে থাকে নি। এথেন্সের অধিবাসী হেরো-ডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তিনি যখন এথেন্সে বাস করতেন, তখনই তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থখানি রচনা করেন। এশিয়া মাইনরের হেলিকারনেসাস নগরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে হেরোডোটাসের জন্ম হয় (৪৮৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)। তিনি ফিনিসিয়া, মিশর, ইরান প্রভৃতি দেশ বেড়িয়ে ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন। ৪৪৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এথেন্সে ফিরে এসে তিনি তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থখানি লেখেন।

হেরোডোটাস

হেরোডোটাসের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে থুকিডিডিস নামে আর একজন প্রতিভাশালী ইতিহাস লেখকের আবির্ভাব হয়। থুকিডিডিসের গ্রন্থের বিষয়বস্তু হচ্ছে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ।

দর্শন ঃ চিন্তার ক্ষেত্রেও পেরিক্লিসের যুগে সক্রেটিসের মতো বিস্ময়কর প্রতিভার সৃষ্টি হয়েছিল। সক্রেটিস শুধু সে যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকই ছিলেন না, তাঁর চিন্তা আজও পর্যন্ত আমাদের সভ্যতার

অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। তিনি কোনো বই লিখে রেখে যান নি। তিনি এথেন্সের রাস্তায় রাস্তার ঘুরে বেড়াতেন এবং সুযোগ পেলেই পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা রকম আলোচনা করতেন। ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে তিনি প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তকে অসার বলে প্রমাণ করতেন। সক্রেটিস বুদ্ধিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন, কোনো কিছুই অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না, যদি বুদ্ধির বিচারে তা অভ্রান্ত বলে মনে না হয়। জ্ঞান ও সত্য—এই দুটি জিনিসকেই তিনি সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। সক্রেটিসের পিতা সোফ্রোনিকাস পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণ করতেন। সক্রেটিস নিজেও সেই কাজ করতেন। অথচ ঐ রকম সাধারণ জীবনযাপন করেও দর্শনশাস্ত্রের চর্চায় তিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানের কোনো অহঙ্কারই তাঁর ছিল না। সক্রেটিসের বহু ছাত্রের মধ্যে প্লেটোর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্লেটোর লেখা থেকেই সক্রেটিস সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা জানতে পারি।

এথেন্সের একদল লোক মনে করতেন যে, সক্রেটিসের কু-শিক্ষায় এথেন্সের যুবকরা নাস্তিক হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে আনিটাস-নামে

সক্রেটিসের বিষপান

এক ব্যক্তিও ছিলেন। তিনি সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।

সক্রেটিসের বিচার হয় এবং বিচারে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এথেন্সের প্রথা অনুসারে, তাঁকে একটি পাত্রে হেমলক বিষ পান করতে দেওয়া হয়। তিনি বিষপান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুকালে তাঁর প্রিয় ছাত্ররা তাঁর চারপাশে ছিলেন। এমনি করে ৩৯৯ খ্রীস্টাব্দে দার্শনিক সক্রেটিসের জীবনদীপ নিবে যায়। এথেন্সের গৌরবের যুগও শেষ হয়।

সক্রেটিসের শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। ধনীর সন্তান প্লেটো সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কাব্য, নাটক প্রভৃতি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন।

প্লেটোর এক ছাত্রের নাম এ্যারিস্টট্ল (৩৮৪-৩২২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ)। ছাত্র হিসেবে এ্যারিস্টট্ল ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। নানা বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর খ্যাতির কথা শুনে ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা ফিলিপ তাঁকে তরুণ যুবরাজ আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

এবার তোমাদের ম্যাসিডন রাজ্যের কথা বলব।

ম্যাসিডন রাজ্যের কথাঃ গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যখন আত্মকলহ চলছিল, তখন থেসালির উত্তরে ছোট ম্যাসিডন রাজ্যটিও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল। লিউক্‌ট্রা এবং ম্যান্‌টিনিয়ার দুটি যুদ্ধে থিবসের সেনাপতি এপামিনোণ্ডাস স্পার্টানদের পরাজিত করার ফলে স্পার্টার পতন হয়, কিন্তু ম্যান্‌টিনিয়ার যুদ্ধে এপামিনোণ্ডাস নিজেও নিহত হন (৩২২ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ)। পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছিল যে, গ্রীস নগর-রাষ্ট্রগুলোকে একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রশক্তির অধীনে একত্রিত করার মতো ক্ষমতা এথেন্সের নেই। স্পার্টারও-যে সে ক্ষমতা নেই ম্যান্‌টিনিয়ার যুদ্ধে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আসলে, ক্রমাগত যুদ্ধ ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলোর শক্তি নিঃশেষিত করে দিয়েছিল। কাজেই ৩৩৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ যখন গ্রীস আক্রমণ করলেন, সে আক্রমণ রোধ করার শক্তি গ্রীসের আর ছিল না। চারোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর গ্রীস ফিলিপের করায়ত্ত হোল, কিন্তু তিনি গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার

চোখে দেখতেন। ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডারও গ্রীক সভ্যতার প্রতি খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন। গ্রীস জয়ের পর ফিলিপ পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযানের আয়োজন করলেন। কিন্তু অভিযান শুরু হওয়ার আগেই পৌসেনিয়াস নামে এক সৈনিকের হাতে তিনি নিহত হন।

আলেকজাণ্ডার যখন ম্যাসিডনের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। কিন্তু বয়সে তরুণ হলেও তাঁর সাহস ও বীরত্ব ছিল অসাধারণ। আলেকজাণ্ডার একে একে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া এবং মিশর জয় করলেন। মিশরে তিনি নিজের নামানুসারে আলেকজান্দ্রিয়া নগর স্থাপন করেন। এর পর তিনি টায়ারে ফিরে গিয়ে মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করেন। আরবেলার কাছে পারস্যসম্রাট ৩য় দারায়ুসের প্রধান সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হয়। পারস্যসম্রাট পালাতে গিয়ে বেসাস নামে এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। আলেকজাণ্ডার পারস্যের সিংহাসন অধিকার করেন এবং পারস্যের রাজকুমারী রক্সানাকে বিয়ে করেন। ব্যাবিলন, সুসা প্রভৃতি আলেকজাণ্ডারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এর পর আলেকজাণ্ডার পার্সিপোলিস অধিকার করেন এবং একবাটানার পার্থিয়ানদের পরাজিত করেন।

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

৩২৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তখন অনেকগুলি ছোটো ছোটো জনপদ ছিল। আলেকজাণ্ডার কয়েকটি রাজ্য জয় করে তক্ষশিলায় এসে উপস্থিত হন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি বিনা যুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। অম্ভির প্রতিবেশী রাজ্য পৌরবের বীর রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রাণপণ যুদ্ধ করেও পুরু পরাজিত হন। বন্দী পুরুকে আলেকজাণ্ডারের সামনে আনা হলে আলেকজাণ্ডার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি আমার

কাছে কিরূপ ব্যবহার আশা করেন ?” পুরু নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, “রাজার মত।” পুরুর সাহসে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁকে শুধু বন্ধুত্বেই বরণ করেন নি, তাঁর রাজ্যও তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।
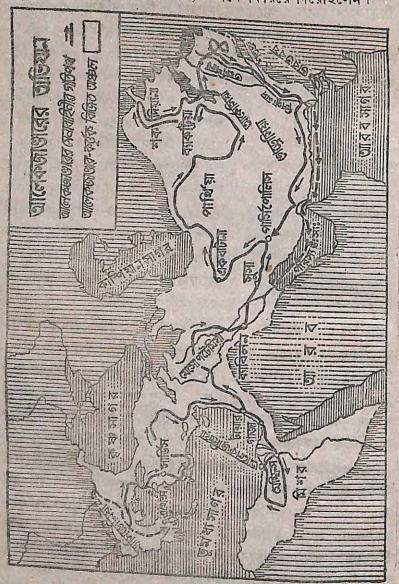
এর পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত এগিয়ে

গেলেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনী বেঁকে বসল। একটার পর একটা যুদ্ধ করে তারা ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় মগধের বিরাট সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হওয়ার ইচ্ছে আর তাদের ছিল না। সুতরাং আলেকজাণ্ডার স্বদেশের দিকে ফিরতে বাধ্য হলেন। ফেরার পথে মালব নামে এক ক্ষত্রিয় উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার আহত হন। মালব উপজাতি যুদ্ধে পরাজিত হয়। এর পর তিনি একদল সৈন্যকে সেনাপতি নিয়ার্কাসের অধীনে জলপথে দেশে পাঠিয়ে দেন। বাকি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে তিনি স্থলপথে ব্যাবিলন যাত্রা করেন। বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে অসহ্য গরম ও পিপাসায় হাজার হাজার গ্রীক সৈন্য মারা যায়। অতি কষ্টে বাকি সৈন্য নিয়ে আলেকজাণ্ডার সুসায় পৌঁছান। এর অল্পকাল পরে ব্যাবিলনে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় (৩২৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)। আলেকজাণ্ডার ইয়োরোপ ও এশিয়া জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও তাঁর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। তাঁর তিন সেনাপতি টলেমি, সেলিউকাস এবং ক্যাসাণ্ডার তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। টলেমি মিশর অধিকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এশিয়ার বিজিত অঞ্চল সেলিউকাস লাভ করেন। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরসহ গ্রীক অধিকৃত অঞ্চল থেকে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। ম্যাসিডন, গ্রীস ও অন্যান্য উপনিবেশ ক্যাসাণ্ডার হস্তগত করেন। এর পরে এক সময়ে গ্রীস রোমের বিশাল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়। আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের ফলে এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

১। ক্রীট দ্বীপটি কোথায়? সেখানকার অধিবাসীদের মিনোয়ান বলা হয় কেন?
২। মিনোয়ানদের সভ্যতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৩। হোমারের যুগে গ্রীকদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?
৪। 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' কার লেখা? 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি'র কাহিনী দুটি সংক্ষেপে বল।

সৈন্যের কাছে নিদারুণভাবে পরাজিত হন। এরপর তিনি স্বদেশ থেকে পালিয়ে যান এবং আত্মহত্যা করে অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ত্রিশ বছর পরে কার্থেজের সঙ্গে রোমের আবার যুদ্ধ হয় (১৪৯ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)। এর নাম তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ। তিন বছরের এই যুদ্ধে কার্থেজ সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। রোমানরা এই সমৃদ্ধ নগরটি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় (১৪৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)।

সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে রোমের জীবনযাত্রা ঃ কার্থেজের পতনের পর রোম বিনা বাধায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ইয়োরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকা এই তিন মহাদেশ জুড়ে ছিল রোমান সাম্রাজ্য। ইয়োরোপে ছিল ব্রিটেন, স্পেন ও গল (বর্তমান ফ্রান্স), সমগ্র বল্কান দেশ ও গ্রীস। এশিয়ায় ছিল গোটা এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ; আর আফ্রিকায় ছিল মিশর, কার্থেজ প্রভৃতি। রোমানদের আগে আর কোন জাতি এত বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে নি। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। এতদিন রোমের শাসন-ব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরে ছিলেন দু'জন কন্‌সাল। এঁরা প্রতি বছর নির্বাচিত হতেন। শাসনকার্যে দু'জন কন্‌সালকে পরামর্শ দেবার জন্যে দুটি পরিষদ ছিল। এই দুটি পরিষদের একটিকে বলা হোত সেনেট। অভিজাতরা ছাড়া কেউ সেনেটের সদস্য হতে পারতেন না। আর এই সেনেটই আসলে রোমের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতেন। জনসাধারণের মতামতের খুব একটা মূল্য সেখানে ছিল না। কিছুদিন পরে রোমে দেখা দিলেন কয়েকজন শক্তিশালী যোদ্ধা। এঁরা রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করলেন। রোমের ইতিহাসে এঁরা ডিক্টেটর বা একনায়ক নামে পরিচিত। সুল্লা, পম্পে, জুলিয়াস সীজার প্রভৃতি ছিলেন এই রকম একনায়ক।

হ্যানিবলের কাল পর্যন্ত রোমের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা খুবই সরল ছিল। রোমের সমাজ প্রথম থেকেই পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগে রোমানদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন দেখা দিল। বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তখন রোমে নানা রকমের জিনিস আসত। মিশর থেকে আসত খাদ্যশস্য, কাচ, সুতির

কাপড় ; গ্রীস থেকে জলপাই, তেল ও শ্বেতপাথর। ইয়োরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসত চামড়া, সোনা, রূপো এবং নানা রকমের মূল্যবান্ বিলাসদ্রব্য। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে অসংখ্য ক্রীতদাস আসার পর থেকে সব শ্রমের কাজই ক্রীতদাসদের দিয়ে করানো হোত। এ সবের ফলে রোমের অভিজাত শ্রেণী খুবই বিলাসী হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বড়ো বড়ো নগর গড়ে ওঠে, যানবাহন ও সৈন্য চলাচলের জন্যে বড়ো বড়ো রাস্তাঘাট তৈরি হয়। কিন্তু রাজধানী রোম নগরীর সৌন্দর্য আর সম্পদ্ আর সব কিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল ; বিরাট বিরাট প্রাসাদ, জয়স্তম্ভ, তোরণ, স্নানাগার প্রভৃতি দিয়ে রোম নগরীকে মনের মতো করে সাজানো হয়েছিল।

রোমে আমোদ-প্রমোদের যে-ব্যবস্থা ছিল, তা প্রাচীনকালে আর কোথাও ছিল না। মানুষের সঙ্গে ক্ষুধার্ত সিংহের লড়াই, বন্য পশুতে পশুতে লড়াই প্রভৃতি দেখতে রোমানরা খুব ভালবাসত। রোমে গ্লাডিয়েটর নামে এক শ্রেণীর পেশাদার যোদ্ধা ছিল। রোমানরা এদের

এম্ফিথিয়েটার

দিয়ে যুদ্ধ করাত। দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে একজন নিহত না হওয়া পর্যন্ত এরকমের যুদ্ধ চলতেই থাকত। চারদিক দিয়ে ঘেরা একটা খোলা

নেকড়ে বাঘিনী শিশু দুটিকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের লালনপালন করতে থাকে। ঐ বাঘিনীর দুধ পান করে রোমুলাস ও

রেমাস বড় হয়ে ওঠে। রোমুলাস এবং রেমাস যেমন ছিল বলিষ্ঠ, তেমনি তেজস্বী। তারা এমুলিয়াসকে হত্যা করে তাদের মাতামহ

নুমিটারকে এ্যাল্‌বালঙ্গার সিংহাসনে বসায়। এর পরে তারা নতুন একটি নগর নির্মাণ করতে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে রোমুলাস ও রেমাসের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া হয়। ফলে, রেমাস প্রাণ হারায়। রোমুলাস তার অনুচরদের নিয়ে একটি নতুন নগর স্থাপন করে। তারই নাম অনুসারে নগরটির নাম হয় রোম।

এটা নিছকই গল্প। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে টাইবার নদীর মোহানা থেকে কয়েক মাইল দূরে প্যালেটিন নামে একটি পাহাড় ছিল। পাহাড়টি ছিল নেহাতই ছোটো। একদল মেষপালক, কৃষক ও ব্যবসায়ী ঐ পাহাড়ে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলে। ঐ পাহাড়টির সঙ্গে আরো ছোটো ছোটো ছ'টি পাহাড় ছিল। কাল-ক্রমে সব ক'টি পাহাড়ে লোকবসতি গড়ে ওঠে। আর এভাবে সাতটি পাহাড় নিয়ে রোম নগর গড়ে ওঠে। এজন্যে রোমকে বলা হয় সাত পাহাড়ের নগরী। রোমের উপকথা অনুসারে রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৭৫৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। ৭১৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমুলাস রোমে রাজত্ব করেন। এর পর রোমের রাজা হন নুমা পম্পিলিয়াস। তিনি চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। রোমে তিনিই ধর্মের প্রবর্তন করেন। রোমের দেবদেবীরা ছিলেন গ্রীক দেবদেবীদের মতো; তাঁদের কেবল নামের পরিবর্তন করা হয়েছিল। এভাবেই গ্রীকদেবতা জিউস হলেন জুপিটার, হেরা হলেন জুনো, হার্মে হলেন মার্কারি আর এথেনা হলেন মিনার্ভা। গ্রীকদের সমুদ্র-দেবতা পসিডনের নাম হোল নেপচুন। পাতালের দেবতা হেড্‌স্ হলেন প্লুটো।

নুমা পম্পিলিয়াসের পর টুলাস হস্টিলিয়াস এবং আঙ্কাস মার্সিয়াস পর পর রাজা হন।

স্পার্টার অধিবাসীদের মতো রোমের প্রাচীন অধিবাসীরাও যুদ্ধ-বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। শরীরকে সুস্থ-সবল রেখে যুদ্ধের নানা রকম কৌশল আয়ত্ত করাকে তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করত। রোমের ক্ষমতা বাড়ায় ক্রমে প্রতিবেশীরাও তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এট্রাসকানরা ছিল সবচেয়ে বড়ো শত্রু। এট্রাসকানরা লোহার হাতিয়ার ব্যবহার করত। তারাও যুদ্ধবিদ্যায় খুব পারদর্শী

৫। গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখ।
৬। গ্রীসের কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের নাম কর। নগর-রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রধান দুটির নাম কী কী ?
৭। গ্রীকরা কোথায় কোথায় উপনিবেশ গড়েছিল ? কেন গড়েছিল ? উপনিবেশগুলো গড়ে ওঠার ফলে গ্রীসের কী কী লাভ হয়েছিল ?
৮। এথেন্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কী জান ?
৯। স্পার্টার শিক্ষাপদ্ধতি কেমন ছিল ? স্পার্টানরা কেমনভাবে জীবন-যাপন করত ?
১০। পেরিক্লিস কে ? তাঁর সম্বন্ধে কী জান ?
১১। 'এথেন্সের গৌরবময় যুগ' বলতে কোন্ সময়কে বোঝায় ? কেন ঐ সময়কে গৌরবময় যুগ বলা হয় ?
১২। স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ হয়েছিল কেন ? যুদ্ধের বিবরণ দাও ও ফলাফল বল।
১৩। সক্রেটিস কে ? তাঁর সম্বন্ধে কী জান ?
১৪। সক্রেটিসের দু'জন ছাত্রের নাম কর। সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় দাও।
১৫। কয়েকজন গ্রীক নাট্যকারের নাম বল। সোফোক্লিসের সম্বন্ধে কী জান ?
১৬। হেরোডোটাস কে ? সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় দাও।
১৭। ফিডিয়াসের সম্বন্ধে কী জান ?
১৮। ম্যাসিডন রাজ্যটি কোথায় ? ম্যাসিডনের রাজা কে ছিলেন ? কী ভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ?
১৯। আলেকজাণ্ডার কে ? তিনি কোন্ কোন্ দেশ জয় করেছিলেন, সংক্ষেপে বল।
২০। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সম্বন্ধে কী জান ?
২১। বন্ধনীর মধ্য থেকে শুদ্ধ উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — — রাজার উপাধি ছিল মিনোস। (ক্রীটের/গ্রীসের)। (খ) নসস্ ছিল — — রাজধানী। (স্পার্টার/ক্রীটের)। (গ) থীসিয়াস ছিলেন — — যুবরাজ। (এথেন্সের/ক্রীটের) (ঘ) মেনিলাউস ছিলেন — — রাজা। (আর্গসের/স্পার্টার) (ঙ) হেলেনকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন — —। (প্যারিস/এগামেমনন) (চ) ওডিসি মহাকাব্যে আছে — — আশ্চর্য ভ্রমণ-কাহিনী। (একিলিসের/ওডিসিয়ুসের) (ছ) এথেনা ছিলেন — — দেবী। (জ্ঞানের/সঙ্গীতের) (জ) ওডিসিয়ুসের স্ত্রীর নাম — —। (হেলেন/পেনিলোপ)

(ঝ) গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের জন্মভূমি——। (মাইলেটাস/সাইরাকিউস) (ঞ) —— বছর বয়স হলেই এথেন্সের তরুণদের নাগরিক বলে গণ্য করা হোত। (কুড়ি/তেইশ) (ট) পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল —— খ্রীস্টপূর্বাব্দে। (৪০৪/৪৩১) (ঠ) সক্রেটিসের পিতার নাম——। (জ্যান্‌থিপাস/সোফ্রোনিসকাস)।

২২। এঁদের সম্বন্ধে কী জান ? (একটি বাক্যে প্রকাশ কর) :
ইজিয়াস, আরিয়াদ্‌নি, প্রিয়াম, জিউস, থেল্‌স্‌, এরিস্টোফিনিস, ড্র্যাকো, সোলন, থুকিডিডিস, এপামিনোণ্ডাস।

২৩। এগুলি সম্বন্ধে কী জান ? (একটি বাক্যে প্রকাশ কর) :
অ্যাক্রোপোলিস, অ্যাপেলা, এফর, ফিস্টাস, ডেলফি, এফেসাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রোম

অবস্থান : আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইতালির টাইবার নদীর পাড়ে গ্রীকরা রোম নামে একটি নগর স্থাপন করে। রোমের উত্তরে আল্পস্ পর্বত এবং দক্ষিণে সিসিলি দ্বীপ। আবার রোমের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে সমুদ্র ! কাজেই বাইরে থেকে রোম আক্রমণ করা খুব সহজ ছিল না। সমুদ্রের খুবই কাছে টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত বলে রোম একটি সুন্দর বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এক সময়ে রোম সমগ্র ইতালি এবং আরও অনেক দেশ জয় করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে।

প্রাচীন উপাখ্যান : রোমের উৎপত্তি-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। এবার তোমাদের সে গল্পটাই বলি। এক সময়ে ইতালিতে এ্যাল্‌বালঙ্গা নামে একটি রাজ্য ছিল। নুমিটার ছিলেন এ রাজ্যের রাজা। নুমিটারের মেয়ে রিয়া সিল্‌ভিয়া রোমুলাস এবং রেমাস নামে দুটি যমজ সন্তান প্রসব করেন। নুমিটারের ভাই এমুলিয়াস নুমিটারকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই সিংহাসন দখল করেন। ভবিষ্যতে যাতে তাঁর সিংহাসন নিষ্কণ্টক হয়, সেজন্যে এমুলিয়াস দুটি যমজ ভাইকে ভেলায় করে টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেন। কিন্তু একটি

ছিল। ৬১৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আঙ্কাস মার্সিয়াসের মৃত্যুর পরে এট্রাসকানরা রোম অধিকার করে। শেষ এট্রাসকান রাজা টার্কুইন ছিলেন খুবই অত্যাচারী। শেষ পর্যন্ত প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে রোম থেকে বিতাড়িত করে (৫১০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে)। টার্কুইনকে বিতাড়িত করার সঙ্গে সঙ্গে রোমে রাজতন্ত্রেরও শেষ হয়। এর পর প্রজারা দু'জন কনসালের ওপর রাজ্যশাসনের সব দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করে। প্রথম দু'জন কনসালের মধ্যে একজনের নাম জুনিয়াস ব্রুটাস। অপর জনের নাম কোলেটিনাস। এভাবেই রোমে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে এট্রাসকানদের, উত্তরে গল উপজাতিদের এবং টারেণ্টাম প্রভৃতি গ্রীক রাজ্যগুলোকে পরাজিত করে রোমানরা সমগ্র ইতালিতে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে। এ সময়েই ম্যাসিডনরাজ আলেকজাণ্ডার পশ্চিম এশিয়া জয় করে ভারত আক্রমণ করেন। এর পর আফ্রিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ বাধে।

রোমের সঙ্গে কার্থেজের সংঘর্ষ ঃ প্রাচীনকালে ফিনিসীয়রা আফ্রিকার উত্তর উপকূলে কার্থেজ নামে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, এ কথা তোমাদের আগেই বলেছি। সে যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে আর ধন-সম্পদে কার্থেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কেউ ছিল না। ফিনিসিয়ার পতনের পর কার্থেজ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। অল্প কয়েকজন ধনী সওদাগর কার্থেজের শাসনতন্ত্র পরিচালনা করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে তাঁরা ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোতে আধিপত্য স্থাপন করেন। সিসিলির অর্ধেকেরও বেশি অংশ তাঁরা অধিকার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিসিলিকে কেন্দ্র করে কার্থেজের সঙ্গে রোমের যুদ্ধ বাধে। তিন বার এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শুরু হয় ২৬৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। প্রায় তেইশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। কার্থেজের বহু শক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। পাঁচ থাকের দাঁড়বিশিষ্ট দ্রুতগামী এই জাহাজগুলোর নাম ছিল কুইন্‌কুইরিম। নৌবলে কার্থেজের তুলনায় রোমানরা ছিল দুর্বল। সুতরাং, প্রথম দিকে যুদ্ধে রোমানরা তেমন সুবিধা করতে পারে নি। কিন্তু পরে তারা যুদ্ধে জয়লাভ

করে। রোমকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বহু টাকা দিতে কার্থেজ বাধ্য হয়। সিসিলি এবং সার্ডিনিয়া রোমের হস্তগত হয়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয় ২৪১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু তিন বছর পরেই রোম সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে তামার খনির লোভে কর্সিকা অঞ্চল দখল করে নেয়। এর ফলে শুরু হয় দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

হ্যানিবল : দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে (২১৮-২০২ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) কার্থেজের সেনাপতি হ্যানিবল অপূর্ব বীরত্ব ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। বালক হ্যানিবল তাঁর পিতা হামিলকার বার্কারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, প্রাণ থাকতে রোমের সঙ্গে মিত্রতা করবেন না। বড়ো হয়ে হ্যানিবল এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। শিক্ষায়, সাহসে ও রণকৌশলে হ্যানিবল গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের চেয়ে এতটুকু কম ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর হ্যানিবল কার্থেজের সেনাদলকে শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত করে তুললেন। তারপর স্থলপথে ইতালি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ৫০ হাজার পদাতিক, ৯ হাজার অশ্বারোহী এবং ৩৭টি রণহস্তী নিয়ে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করলেন। পর্বত অতিক্রম করার সময়ে হ্যানিবলের বহু সৈন্য-সামন্ত মারা যায়। তথাপি অশেষ কষ্ট, খাদ্যাভাব এবং প্রচণ্ড শীত সহ্য করে হ্যানিবল ইতালির সমতল ক্ষেত্রে যখন নেমে এলেন, রোমানরা তাঁর অসাধারণ বীরত্ব ও দুঃসাহসে অবাক হয়ে গেল। হ্যানিবল-যে পাহাড় ডিঙিয়ে তাদের এভাবে আক্রমণ করতে পারবেন, রোমানরা তা ভাবতেই পারে নি। রোমান সেনাপতি ফেবিয়াস জানতেন যে, হ্যানিবলের সঙ্গে সামনা-সামনি যুদ্ধে রোমানদের পরাজয়ের সম্ভাবনাই বেশি। তাই তিনি সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে নানা ভাবে হ্যানিবলকে বিব্রত করে তুললেন। শেষে রোমান সেনাপতি সিপিও কার্থেজ আক্রমণ করলে হ্যানিবল বাধ্য হয়ে ইতালি ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যান। জামা নামে একটি জায়গায় সিপিও হ্যানিবলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করে সিপিও ইতিহাসে সিপিও আফ্রিকেনাস্ নামে পরিচিত হন। ষোল বছর ধরে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ হয়। সুদীর্ঘকালের এই যুদ্ধে হ্যানিবল একবারও পরাজিত হন নি। জামার যুদ্ধে হ্যানিবল রোমান

জায়গায় এসব মল্লযুদ্ধ বা পশুতে পশুতে লড়াই প্রভৃতি হোত। চার দিকে এখনকার মতো গ্যালারি বা লোকের বসবার ব্যবস্থা ছিল। এরকম স্থানকে 'এম্ফিথিয়েটার' বলা হোত। কলোসিয়াম নামে একটি প্রেক্ষাগৃহে বসে রোমানরা এইসব ক্রীড়া-কৌতুক উপভোগ করত। এখানে এক সঙ্গে ৪৫০০০ দর্শক স্বচ্ছন্দে বসতে পারত। কলোসিয়ামের নির্মাণকার্য শুরু করেছিলেন রোম সম্রাট ভেস্পাসিয়ান। তাঁর পুত্র
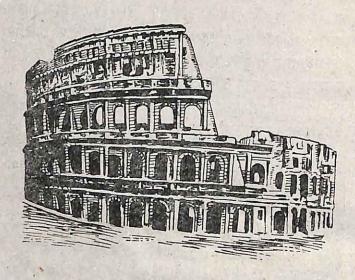
রোমের কলোসিয়াম

সম্রাট ডোমিনিটানের রাজত্বকালে কলোসিয়ামটির নির্মাণকার্য শেষ হয় ৮০ খ্রীস্টাব্দে। রোম নগরীতে অনেক স্নানাগার নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখানে সৌখিন লোকেরা স্নান এবং গল্পগুজব করতেন। ফোরাম ছিল কেনাবেচার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র।

সাম্রাজের যুগে রোমের অধিবাসীদের সরকারী কর্মচারী, সৈনিক ও ক্রীতদাস এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কৃষি ও শিল্পের সব কাজই করত ক্রীতদাসরা; ক্রীতদাসদের দিয়ে অনেক সময়ে শিক্ষাদানের কাজটিও করানো হোত। বলতে গেলে, রোমের অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্রীতদাস।

প্রাচীন যুগের রোমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকদের বলা হোত প্যাট্রিসিয়ান। যারা গরীব তারা প্লেবিয়ান নামে পরিচিত ছিল।

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের কথা ঃ রাষ্ট্রের যা-কিছু সুখ-সুবিধা এবং অধিকার তা প্যাট্রিসিয়ানরাই ভোগ করতেন। তাঁরা প্লেবিয়ান-দের অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন। প্যাট্রিসিয়ানরা সেনেট নামে একটি পরিষদ গঠন করে নিজেরাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। এদিকে গরীব লোকেরা চাষবাস করত, যুদ্ধের সময়ে সৈন্য হিসেবে খাটত, অথচ তাদের কোনো অধিকারই ছিল না। ৪৫১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমে প্রথম আইন বিধিবদ্ধ হয়। বারোটি ব্রোঞ্জের ফলকে আইন খোদাই করে রোমের ফোরামে রেখে দেওয়া হয়। গ্রীসের পেরিক্লিসের আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আইনগুলো রচিত হয়। ৪৪৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দে প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ানদের মধ্যে বিবাহও বিধিবদ্ধ করা হয়। এভাবে প্রায় দুশো বছর ধরে প্লেবিয়ানরা তাদের নীরব সংগ্রাম চালিয়ে একটু একটু করে আইনের সাহায্যে তাদের অধিকার আদায় করে নেয়।

রোমে নাগরিক অধিকার ঃ রোমের সত্যিকারের নাগরিক ছিলেন প্যাট্রিসিয়ান বা অভিজাতরা। প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ এবং গরীবের নাগরিক অধিকার ছিল না বললেই হয়। পরে, সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগে, বিজিত রাজ্যের অধিবাসীদেরও রোমের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। কোনো ক্রীতদাস ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে রোমের নাগরিক হতে পারত।

রোমে ক্রীতদাসের জীবন ঃ রোমের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিল ক্রীতদাস। রোমানরা ক্রীতদাসদের দিয়ে সব কাজই করাত। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকে ছিল যুদ্ধবন্দী ; আবার অনেকে ঋণ শোধ করতে না পেরে ক্রীতদাস হোত। রোমের বড় বড় নগরের বাজারে ক্রীতদাস বা গোলাম বেচাকেনা হোত। দাস-ব্যবসার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্রটি ছিল ঈজিয়ান উপসাগরের ডেলস্ দ্বীপে। সেখানকার বাজারে নাকি প্রতিদিন ১০,০০০ ক্রীতদাস বেচাকেনা হোত। ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষের কাজ, শস্য পেষাই করার কাজ করানো হোত। ক্রীতদাসেরা খনিতেও কাজ করত ; আবার রাস্তাঘাট, বাড়িঘর প্রভৃতি তৈরি করত, দাঁড়ও টানত।

কাজে কোথাও এতটুকু ত্রুটি ঘটলে ক্রীতদাসদের পিঠে চাবুক পড়ত। কাজ করার সময়ে ক্রীতদাসরা একে অপরের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারত না। তাদের সারা বছরে মাত্র একটি জামা দেওয়া হোত। রাত্রে ক্রীতদাসদের কয়েদখানায় আটকে রাখা হত।

রোমের ক্রীতদাস

কোনো কোনো ক্রীতদাসকে নানা রকম অস্ত্র চালনা করা ও মল্লযুদ্ধ শেখানো হোত। এদের নাম ছিল গ্লাডিয়েটর। গ্লাডিয়েটরদের অনেক সময়ে বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করতে হোত। এরকম লড়াই দেখতে রোমানরা খুব ভালবাসত। মালিকরা অবাধ্য ক্রীতদাসকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে অন্যান্য ক্রীতদাসের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করত।

সিসিলিতে প্রথম ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ হয়। সেখানে ড্যামো-ফিলাস নামে একজন ধনী ব্যক্তি তাঁর ক্রীতদাসদের ওপর খুব অত্যাচার করতেন। সেখানকার ক্রীতদাসরা ড্যামোফিলাসকে হত্যা করে তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা প্রায় সমগ্র সিসিলি দখল করে নেয়। রোম থেকে সৈন্য পাঠিয়ে বহু কষ্টে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। এর কয়েক বছর পরেও সিসিলিতে ক্রীতদাসরা আবার বিদ্রোহ করে। কিন্তু স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে যে-বিদ্রোহ হয়েছিল, প্রাচীনকালে তেমন বিদ্রোহ আর কোথাও হয় নি।

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ ঃ ৭৩ খ্রীস্টপূর্বাব্দে এই বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শেষ হয় ৭১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। রোমের অধীন ছোট কাপুয়া শহরে প্রায় ২০০ জন ক্রীতদাস বিদ্রোহের ষড়্‌যন্ত্র করে। কিন্তু ষড়্‌যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। তবুও প্রায় আশি জন ক্রীতদাস কয়েদ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিসুবিয়স পর্বতের ওপরে আশ্রয় নেয়। খবর পেয়ে প্রায় তিন হাজার রোমান সৈন্যের একটি দল এসে বিসু-

বিয়স পর্বতের পাদদেশে অবতরণের পথটিকে অবরোধ করে ফেলে। ঐ একটি মাত্র পথেই বিসুবিয়স থেকে নিচে নামা যেত। কিন্তু এই প্রচণ্ড বিপদেও স্পার্টাকাস এতটুকু ভয় না পেয়ে আত্মরক্ষার একটি অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করেন। আঙুর গাছের লতা দিয়ে দড়ি তৈরি করে এক-এক করে ক্রীতদাসরা রাতের অন্ধকারে পাহাড় থেকে নেমে পড়ে। তারপর পেছন থেকে এসে আক্রমণ করে তারা রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্পার্টাকাসের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইতালির নানা অঞ্চল থেকে হাজার হাজার ক্রীতদাস এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। ক্রীতদাসেরা প্রথমে সামান্য একখানা লাঠি আর ছুরি নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। পরে ক্রমাগত আক্রমণ করে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে নানা রকমের হাতিয়ার সংগ্রহ করে। নানা-ভাষাভাষী ক্রীতদাসদের মধ্যে স্পার্টাকাস শৃঙ্খলা প্রবর্তন করেন। রোমান সেনাপতি ক্রেসাসের সঙ্গে স্পার্টাকাসের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহু রোমান সৈন্য নিহত হয়। ৭১ খ্রীস্টপূর্বাব্দে রোমানদের সঙ্গে স্পার্টাকাসের শেষ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে স্পার্টাকাস বীরের মত মৃত্যুবরণ করেন। পম্পের আদেশে প্রায় ৬,০০০ বন্দী ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ সফল হয় নি ঠিকই, তবে বিদ্রোহে অত বড়ো রোম সাম্রাজ্যের ভিত্ পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।

জুলিয়াস সীজার ঃ রোমে যে এক সময়ে কয়েকজন শক্তিশালী ডিক্টেটর বা একনায়কের আবির্ভাব হয়েছিল, এ কথা তোমাদের বলেছি। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন জুলিয়াস সীজার। গ্রীসে যেমন বীরত্বে ও সাহসিকতায় আলেকজাণ্ডার অদ্বিতীয় ছিলেন, রোমেও তেমনি ছিলেন সীজার। তিনি এক প্যাট্রিসিয়ান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। ক্ষমতা এবং গৌরব অর্জন করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সীজার খুব ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। সীজার প্রথমেই গলদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। দীর্ঘ আট বছর যুদ্ধের পর তিনি গলদের রাজ্য (বর্তমান ফ্রান্স) অধিকার করেন। হাজার হাজার নারী-পুরুষকে তিনি ক্রীতদাসে পরিণত করেন। বহু ধনরত্নও তিনি লাভ করেন। এর পর সীজার ৪৯

খ্রীস্টপূর্বাব্দে সসৈন্যে রোমে উপস্থিত হলে রোম সাধারণতন্ত্রের প্রধান সেনাপতির পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। পম্পে ছিলেন সীজারের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সীজারের সঙ্গে যুদ্ধে পম্পে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত পলায়ন করতে গিয়ে তিনি নিহত হন। একে একে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে সীজার অবশেষে রোম নগরীতে ফিরে আসেন। তখন সীজারের ক্ষমতার সীমা ছিল না। তাঁর আদেশই সেনেট মেনে চলত। সীজার নিজেকে সম্রাট বলতেন। রাজার মতোই তিনি সম্মান পেতেন। তিনি যে-চেয়ারখানিতে বসতেন, তা তৈরি হয়েছিল হাতির দাঁত আর সোনা দিয়ে। সীজারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সেনেটের কয়েকজন সদস্য ভাবলেন বোধহয় সীজার এবার সম্রাট হয়ে বসবেন। তাই তাঁরা গোপনে চক্রান্ত করে সীজারকে হত্যা করলেন ৪৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। এই ষড়্‌যন্ত্রকারীদের অন্যতম ছিলেন ব্রুটাস।

জুলিয়াস সীজার

সীজারকে হত্যা করে কিন্তু কোন লাভই হোল না। সীজারের পোষ্যপুত্র অক্টাভিয়াস আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন। তিনি শেষ পর্যন্ত রোমের প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদ করে নিজেকে সম্রাট অগাস্টাস বলে ঘোষণা করলেন। এভাবে রোমে প্রজাতন্ত্রের শেষ হলো এবং রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোল। অগাস্টাসের সময় থেকে আরম্ভ করে রোমে অনেক সম্রাট রাজত্ব করে গেছেন। ক্যালিগুলা নামে একজন নিষ্ঠুর ও বিলাসী সম্রাট ছিলেন। গুপ্ত ঘাতকের হাতে তিনি প্রাণ হারান। তবে হত্যা আর নিষ্ঠুরতায় সম্রাট নীরোর কোন জুড়ি ছিল না। শোনা যায়, একবার আগুন লেগে রোমের বাড়ি-ঘর-মন্দির যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, তখন নাকি নীরো বীণা বাজাচ্ছিলেন। আবার মার্কাস অরেলিয়সের মতো সম্রাটও ছিলেন। তিনি দর্শন ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রজাদের কল্যাণের কথাও তিনি চিন্তা করতেন। মৌর্য সম্রাট অশোকের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা চলে।

রোমের দাসপ্রথাই শেষ পর্যন্ত রোমের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ক্রীতদাসদের দিয়ে চাষবাস করাবার ফলে রোমের কৃষকরা নিরন্ন হয়ে পড়েছিল। রোমে শিল্পের ক্ষেত্রেও কোনো উন্নতি হয় নি। জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশই ছিল ক্রীতদাস। তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতনের ফলে তারা সব সময়েই রাষ্ট্রের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে থেকে যখনই কোনো আক্রমণ আসত, সাম্রাজ্যের ভেতরে অসংখ্য ক্রীতদাস তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত। ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে রোম-সাম্রাজ্য দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ নিয়ে যে-নতুন সাম্রাজ্যটি গড়ে ওঠে, কনস্টান্টিনোপলে তার রাজধানী স্থাপিত হয়। ৪১৯ খ্রীস্টাব্দে গথ নামে এক বর্বর জাতির আক্রমণে পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয়। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

খ্রীস্টধর্মের অভ্যুদয়ঃ রোমের ক্রীতদাসরা বহু দেবতায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। ঐ দেবতারা তাদের দুঃখের জীবনে এতটুকু আশা বা আনন্দের আলো দেখাতে পারেন নি। অত্যাচারিত মানুষ সর্বশক্তিমান্ এক ঈশ্বরের কথা শুনে তাঁর প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হতে লাগল। যীশু তাদেরই মতো সাধারণ ঘরে জন্মেছিলেন; তাদেরই মতো নির্যাতন ভোগ করেছেন মানুষের হাতে। যীশুর বাণী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত আকারে প্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং, রোমের নির্যাতিত ক্রীতদাস এবং সাধারণ গরীবদুঃখীও ধীরে ধীরে খ্রীস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। খ্রীস্টধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীস্ট এবং তাঁর ধর্মমত-সম্বন্ধে এখন তোমাদের বলব।

যীশুর কাহিনীঃ মহাবীর, বুদ্ধ, জরথুস্ত্র ও কনফুসিয়সের মতো যীশুও পৃথিবীতে শান্তির বাণী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরই মতো যীশুও এশিয়ার পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে-ধর্ম প্রচার করেন, তাকে খ্রীস্টধর্ম বলা হয়। খ্রীস্টধর্ম যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরা খ্রীস্টান নামে পরিচিত।

তোমরা তো ইহুদিদের জুডা রাজ্যের কথা শুনেছ। জুডা ছিল রোম-সাম্রাজ্যের অধীন। তখন রোমের প্রথম সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বকাল। বেথ্লেহেম নামে একটি গ্রামে যীশুর জন্ম হয়। যীশুর পিতার নাম

জোসেফ এবং মায়ের নাম মেরী। খ্রীস্টানরা মনে করেন, যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান। জোসেফ জাতিতে ছিলেন ইহুদি। তিনি ছুতোরের কাজ করতেন। যীশু ছোটবেলায় লেখাপড়া শেখার সুযোগ পান নি। কৈশোরে তিনি জন নামে এক ইহুদি ধর্মপ্রচারকের কাছে দীক্ষা নেন। যীশু গ্যালিলির ধীবরদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার নেই; শক্তি বা সম্পদ দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওয়া যায় না। সকল মানুষ সকল মানুষের ভাই। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে যীশু রোগীর সেবাও করতেন। তাঁর স্পর্শে দুরারোগ্য রোগও সারত। গোঁড়া ইহুদিদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন। ফলে যীশুর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে আসে। বিচারে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

যীশুর ধর্মমত : যীশু সুন্দর সুন্দর গল্পের সাহায্যে উপদেশ দিতেন। তাঁর উপদেশগুলো খুবই মূল্যবান্। যীশু বলতেন, যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, তোমার বাঁ গালটি বাড়িয়ে দিও। যারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তুমি তাদের আশীর্বাদ কোরো। যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তুমি তাদের ভালোবেসো। লোক দেখিয়ে দান কোরো না। লোভ, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি ত্যাগ করে, সকলকে ভাইয়ের মতো ভালোবেসে পবিত্র জীবন যাপন—এগুলো যীশুর শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা দেশে দেশে তাঁর ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। এর জন্যে তাঁদের অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। প্রচারকদের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্যাতন করেছেন রোমান সম্রাটরা। রোমের সম্রাটরা তাঁদের হিংস্র পশুর মুখে ফেলে দিতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খ্রীস্টধর্মেরই জয় হোল। যীশুর মৃত্যুর প্রায় তিনশো বছর পরে রোমের সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর বিশাল রোম-সাম্রাজ্যের দিকে দিকে এই ধর্ম প্রচারিত হয়। আজ পৃথিবীর বিপুল-সংখ্যক নরনারী খ্রীস্টধর্মাবলম্বী।

অনুশীলনী

১। রোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-প্রাচীন উপাখ্যানটি পড়েছ, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
২। রোমের কয়েকজন দেবদেবীর নাম কর।
৩। রোমের সঙ্গে কার্থেজের যে-সংঘর্ষ হয়েছিল, সংক্ষেপে তার বিবরণ দাও।
৪। হ্যানিবল কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?
৫। সাম্রাজ্য-বিস্তারের যুগে রোমের জীবনযাত্রা কেমন ছিল?
৬। কাদের প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান বলা হয়?
৭। 'রোমে ক্রীতদাসের জীবন' নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
৮। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাসদের যে-বিদ্রোহ হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৯। জুলিয়াস সীজার কে? তাঁর পরিচয় দাও।
১০। জুলিয়াস সীজারের পরে রোমের ইতিহাস-সম্বন্ধে কী জান?
১১। যীশুর সম্বন্ধে কী জান?
১২। তিনি যে-ধর্ম প্রচার করেন তার মূল কথাগুলি কী কী?
১৩। কী ভাবে খ্রীস্টধর্ম বিস্তারলাভ করে?
১৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) — ছিলেন এ্যাল্‌বালঙ্গার রাজা।
(খ) প্রথম দু'জন — মধ্যে একজনের নাম জুনিয়াস ব্রুটাস।
(গ) হ্যামিলকার বার্কার ছিলেন — পিতা।
(ঘ) কুইন্‌কুইরিম এক প্রকার যুদ্ধ — নাম।
(ঙ) কার্থেজের সঙ্গে রোমের যে-যুদ্ধ হয় তার নাম — যুদ্ধ।
(চ) রোমে — নামে একশ্রেণীর পেশাদার যোদ্ধা ছিল।
(ছ) রোমের কলোসিয়ামের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল সম্রাট — রাজত্বকালে।
(জ) রোমে কেনাবেচার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র ছিল —।
(ঝ) — ছিলেন জুলিয়ার সীজারের একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।
(ঞ) যীশুর পিতার নাম ছিল —।
(ট) যীশু — নামে এক ইহুদি ধর্মপ্রচারকের কাছে দীক্ষা নেন।
(ঠ) —স্পর্শে দুরারোগ্য রোগও সারত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চীন

(শাং বংশের আমল থেকে)

শাং বা য়িন বংশ ঃ শাং বা য়িন্ বংশের রাজারা প্রায় সাড়ে ছশো বছর (১৭৫০-১১২৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) চীনে রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের আমল থেকেই আমরা চীনের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারি। বহুকাল আগে শাং রাজধানী মাটির নিচে বসে গিয়েছিল। ওপর থেকে শুধু একটা ঢিবি দেখা যেত। লোকে এই ঢিবিটাকে বলত য়িনের ঢিবি। পরে এই ঢিবি খুঁড়ে একটা বিরাট নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া, চীনা সভ্যতার বহু চিহ্নও পাওয়া গেছে। এরকম চিহ্নের মধ্যে আছে কতকগুলো কচ্ছপের খোলা। কচ্ছপের খোলা-গুলোতে অজানা অক্ষরে কি সব লেখা ছিল। পরে পণ্ডিতেরা সে-সব লেখার পাঠোদ্ধার করেছেন ; তা থেকে চীনের অনেক কথা জানা গেছে। য়িনের ঢিবি খুঁড়ে আরও যেসব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে

চীনের চিত্রলিপি

তার মধ্যে আছে ব্রোঞ্জের নানা জিনিসপত্র, এনামেলের পাত্র, রং ও পালিশ করা নানা রকমের মাটির পাত্র। চীনারা এই যুগে কচ্ছপের খোলার ওপরে নানা রকমের লেখা লিখত এবং ছবি আঁকত। কচ্ছপের খোলার ওপরে প্রশ্ন লিখে রাখলে নাকি দেবতার নির্দেশ পাওয়া যেত। বর্শা ও তীর নিয়ে শিকারের ছবি এবং কুকুর, শুয়োর ও ষাঁড় প্রভৃতি জন্তুরও ছবি পাওয়া গেছে। চীনাদের কাছে পূর্বপুরুষরা খুব সম্মান পেতেন। তারা মৃত পূর্বপুরুষদের পুজো করত। নানা দেবদেবীর পুজোরও প্রচলন ছিল।

শাং বা য়িন বংশের পর চৌ-বংশ রাজত্ব করে।

চৌ-রাজবংশ (১১২৫-২৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) : ১১২৫ খ্রীস্টাব্দে চীনে চৌ-রাজবংশের রাজত্ব শুরু হয়। ইয়াংসি নদী-উপত্যকার উর্বর জনপদে চৌ-রাজারা খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। লোয়াং-এর কাছে চেং-চাউ নামে একটি জায়গায় তাঁরা তাঁদের রাজধানী নির্মাণ করেন। চৌ-রাজবংশের প্রথম রাজা 'উ' চীনে জমিদারশ্রেণীর প্রবর্তন করেছিলেন। জমিদারদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে তিনি প্রত্যেককে কিছু পরিমাণ জমি দান করেন। জমিদারেরা আবার সেই জমি প্রজাদের মধ্যে বিলি করে দেন। প্রজারা জমিদারের জমি চাষ করত, জমিদারের জন্যে মাছ ধরত, কাঠ কাটত এবং নানা ফাই-ফরমাশ খাটত। প্রথম প্রথম চৌ-রাজারা জমিদার বা সামন্তদের বেশ কড়া শাসনে রেখেছিলেন। রাজ-দরবারে এসে চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে নিজেদের জমিদারির যাবতীয় সংবাদ তাদের জানাতে হোত। প্রজাদের ওপর জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করা জন্যে চৌ-রাজারা পাঁচ বছর অন্তর রাজ্যের মধ্যে ঘুরে ঘুরে। নিজেদের চোখে দেখতেন প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করে কিনা। কিন্তু কালক্রমে রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। জমিদারেরা তখন একরকম স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করতে থাকে।

নানারকম আভ্যন্তরীণ গোলমাল সত্ত্বেও চৌ-রাজাদের আমলে চীনে সভ্যতার বিকাশ ঘটে। এই যুগেই প্রথম পশমের কাপড়ের চলন হয়, কৃষকরা লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতে শেখে। লোহার অস্ত্রশস্ত্রও এ যুগে ব্যবহার করা হয়। দেশের ভেতরে ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। চৌ-রাজাদের আমলেই চীন থেকে পারস্যে প্রচুর রেশমী কাপড় যেত। গুটিপোকা থেকে রেশমের কাপড় বোনার আশ্চর্য কৌশলটি চীন বহুকাল পর্যন্ত গোপন রেখেছিল। এ যুগেই ধাতু থেকে মুদ্রা তৈরি করা হয়। সুন্দর সুন্দর ব্রোঞ্জের পাত্র নির্মাণে চৌ-যুগের শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

চৌ-রাজাদের সময়ে চীনে লেখাপড়া-জানা পণ্ডিতশ্রেণীর মানুষেরা রাজদপ্তরে কাজ করতেন, আবার তাঁরা বড়লোকদের বাড়িতে গিয়েও ছাত্র পড়াতেন। জনসাধারণ এঁদের খুবই শ্রদ্ধার চোখে

দেখত। জীবনের উদ্দেশ্য কি—এরকম নানা চিন্তা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা সময় কাটাতেন। এসব পণ্ডিতেরা অনেক সময় দেশের নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এবং দেশের মানুষের কাছে তাঁদের চিন্তাকে তুলে ধরতেন। এমন একজন পণ্ডিত ছিলেন কুন্‌-ফুটজু। কনফুসিয়স নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত।

এবার তোমাদের কনফুসিয়সের কথা বলব।

কন্‌ফুসিয়স (আনুমানিক ৫৫০-৪৮০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ): ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ পশুবলি ও নানারকম যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের বহর দেখে

কন্‌ফুসিয়স

মানুষের কল্যাণের জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ঠিক সেই কালে চীনেও কনফুসিয়স নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। চীনের এই মহাপুরুষও মানুষের দুঃখ দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

কনফুসিয়স যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন চীনের বড়ই দুর্দিন। দেশ জুড়ে কেবল অশান্তি আর ঝগড়া-বিবাদ। তখনকার চীন ছিল ছোটো ছোটে রাজ্যে বিভক্ত, আর সে-সব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদ লেগেই থাকত। সমাজে সাধুতার কোনও মূল্য ছিল না। অত্যাচার আর অবিচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। মানুষের এই দুর্গতি দেখে কনফুসিয়স ব্যাকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন। এক সময় তিনি

এই সত্যের সন্ধান পেলেন যে, একমাত্র চরিত্রের গুণেই মানুষ দুঃখ আর বিপদকে জয় করতে পারে।

কনফুসিয়স প্রাচীন শাং রাজবংশের সন্তান। তাঁর যখন তিন বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা মারা যান। কনফুসিয়স মায়ের স্নেহযত্নে মানুষ হয়েছিলেন। দারিদ্র্যের জন্য লেখাপড়া শিখতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি ইতিহাস, সঙ্গীত ও ধনুর্বিদ্যা ভালো করে শিখেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কনফুসিয়স একটু গম্ভীর এবং ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। দেখতে তিনি ছিলেন কদাকার, কিন্তু তিনি ছিলেন খুবই জ্ঞানী, ঠিক যেমনটি ছিলেন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস।

কনফুসিয়সের বয়স যখন ২২ বছর তখন তিনি নিজের বাড়িতেই একটি বিদ্যালয় খুলে সেখানে ছাত্র পড়াতে শুরু করেন। ছাত্ররা প্রশ্ন করত, কনফুসিয়স ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। এভাবেই জিজ্ঞাসা ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে ছাত্ররা শিখত ইতিহাস, কাব্য, আচার-ব্যবহার।

কনফুসিয়সের শিক্ষা: কনফুসিয়স বলতেন পিতার কর্তব্য যেমন সন্তানকে মানুষ করে তোলা, সন্তানেরও তেমনি উচিত পিতা-মাতাকে মান্য করা, তাঁদের সেবা-যত্ন করা। তা ছাড়া, প্রতিবেশীদের প্রতিও মানুষের কতকগুলি কর্তব্য আছে। বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করা উচিত। সমাজে থেকে কর্তব্য পালন করে, সংসার এবং সমাজের নিয়ম পালন করে, আত্মোন্নতি করা সম্ভব। সৌজন্য হোল শিক্ষার সার। চরিত্রবলের দ্বারাই নিজের ও সমাজের উন্নতি করা সম্ভব। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীর কাছ থেকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছিলেন, পৃথিবীর কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাট সে রকম শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চীনের প্রাচীর: খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হয়। শি-হুয়াংতি নামে চিন-বংশীয় একজন সামন্তই প্রথম বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত করে একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এ সময় থেকেই দেশের নাম হয় চীন। ২২০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে তিনি রাজা হন। বর্বর জাতির

আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার জন্যে তিনি এক বিরাট প্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। চীনের উত্তর দিকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত ধরে সমুদ্র পর্যন্ত এই প্রাচীরটি লম্বায় ছিল ১,৪০০ মাইলেরও বেশি। প্রাচীরটির উচ্চতা ছিল ২৫ থেকে ৩০ ফুট। প্রাচীরটি এত চওড়া ছিল যে, ওপর দিয়ে ছ'জন অশ্বারোহী পাশাপাশি যেতে পারত। চীনের এই প্রাচীরটি ছিল পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের মধ্যে একটি। চৌদ্দ বছর (২১৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০৪ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) ধরে অসংখ্য মানুষ পরিশ্রম করে প্রাচীরটি গেঁথে তুলেছিল।
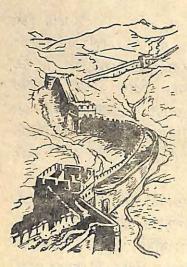
চীনের প্রাচীর

চিন্ সাম্রাজ্য : শি-হুয়াংতি ছিলেন চিন্-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চীনের বিখ্যাত প্রাচীর ছাড়াও তিনি তাঁর রাজ্যে বহু রাস্তাঘাট তৈরি করান। বিভিন্ন অঞ্চল যাতে এক শাসনের অধীনে আসে, এজন্যে তিনি প্রাচীন সব পুথিপত্তর পুড়িয়ে ফেলেন। আর এভাবেই কনফুসিয়সের বহু মূল্যবান উপদেশ (যা তাঁর শিষ্যরা লিখে রেখেছিলেন) চিরকালের মতো নষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী লি-সুর পরামর্শেই নাকি এ কাজ করেছিলেন। শি-হুয়াংতি চেয়েছিলেন প্রজারা তাঁকে দেবতার মতো পুজো করুক। শাসনকার্যে কঠোরতা দেখালেও তিনিই প্রথম চীনে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের প্রবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাঁচ বছর যেতে না যেতে চিন্ সাম্রাজ্যের পতন হয়। কাও-সু নামে এক ব্যক্তি এর পরে হ্যান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই হ্যান্ বাজবংশের কাহিনী তোমরা পরে জানবে।

অনুশীলনী

১। শাং বংশের রাজাদের কথা জানা গেল কেমন করে?

২। 'য়িনের ঢিবি' খুঁড়ে কী কী পাওয়া গেছে?

৩। চৌ-রাজারা কোথায় রাজত্ব করতেন? তাঁদের রাজধানী কোথায় ছিল?

৪। চৌ-রাজবংশের প্রথম রাজা কে? তাঁর কীর্তির কথা বল।

৫। চীনে জমিদারি বা সামান্ত-প্রথা কে প্রবর্তন করেন? সামন্ত-প্রথা প্রবর্তনের ফল কী হয়েছিল?

৬। চৌ-রাজাদের আমলে চীনের সভ্যতার বিবরণ দাও।

৭। কনফুসিয়স সম্বন্ধে কী জান?

৮। 'কনফুসিয়সের শিক্ষা' নিয়ে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখ।

৯। চিন্ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?

১০। চীনের প্রাচীর কে নির্মাণ করেন? কেন করেন? প্রাচীরটির বর্ণনা দাও।

১১। চিন্ রাজবংশের ক'জন রাজা রাজত্ব করেন? কীভাবে ঐ বংশের পতন হয়?

১২। ভুল শুদ্ধ কর:

(ক) চীনারা কাগজের ওপরে নানা রকমের লেখা লিখত। (খ) চৌ-রাজবংশের প্রথম রাজার নাম শি-হুয়াংতি। (গ) চৌ-বংশের রাজা 'উ' জমিদারদের সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। (ঘ) শাং-রাজাদের আমলেই চীন থেকে পারস্যে প্রচুর রেশমী কাপড় যেত। (ঙ) কনফুসিয়স সংসার ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারত

আর্যদের আগমন: সিন্ধু-উপত্যকায় যে-সভ্য জাতি নগর গড়ে তুলেছিল, তাদের কথা তোমাদের আগেই বলেছি। এক সময় হঠাৎ এই সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছরেরও আগে এক দল মানুষ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ভারতের অন্তর্গত পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। এরা আর্য নামে পরিচিত। এদের আদি বাসস্থান ছিল কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে অথবা পশ্চিম

ইয়োরোপে। কারো মতে, তারা মধ্য এশিয়ায় বাস করত। ভারতে আর্যদের যে-শাখা আসে তাদের সঙ্গে এখানকার আদি বাসিন্দাদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে আদি বাসিন্দাদের কিছু অংশ পাঞ্জাব ছেড়ে চলে যায়, আর যারা ছিল তারা আর্যদের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়।

বেদ ঃ বেদের অর্থ—যা জানা যায়, অর্থাৎ 'জ্ঞান'। আর্যরা নানা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানের স্তব-স্তুতি করত। এই স্তব-স্তুতির সংকলনই বেদ। বেদ সংখ্যায় চারখানা—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋগ্বেদই হোল সবচেয়ে প্রাচীন। সবশেষে রচিত হয় অথর্ববেদ। এতে রোগ সারাবার এবং অপদেবতা দূর করার মন্ত্রতন্ত্র আছে। ঋগ্বেদ পদ্যে লেখা। এর শ্লোকগুলো খুব মধুর এবং কাব্যময়। বেদ থেকে আমরা আর্যদের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারি।

বৈদিক যুগের সমাজ ঃ আর্যরা পরিবারবদ্ধ হয়ে বাস করত। পরিবারে কর্তাই ছিলেন প্রধান। কয়েকটি পরিবার নিয়ে ছিল একটি গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে বলা হোত দলপতি বা গ্রামণী। আর্যরা গ্রামে বাস করত। পুরুষেরা চাষবাস ও পশুপালন করত, আর মেয়েরা করত নানা রকমের ঘরের কাজ। জমিজমাতে কারুর ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, জমি ছিল সকলের। আর্যরা চামড়া ও মাটির কাজ, কাপড়-বোনা, রং-করা ও নকশার কাজ জানত। তারা সুতো, পশম এবং পশুর চামড়ার পোশাক পরত। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল দুধ, শস্য, ফল ও মাংস। যজ্ঞের সময় তারা সোমরস পান করত। আর্যরা পশুশিকার করত, রথ চালাত, পাশা খেলত এবং গান-বাজনা করত। সমাজে নানা কাজ বা বৃত্তি ছিল, আর পরবর্তী কালে বৃত্তিকে কেন্দ্র করে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়। জনসাধারণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রাহ্মণরা পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ এবং জ্ঞানচর্চা করত। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজ্যরক্ষা করত, বৈশ্যেরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও পশুপালন করত। অনার্যরা এই তিন জাতির সেবা করত। তাদের বলা হোত শূদ্র।

আর্যসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। নারীদের কেউ কেউ বিবাহ না

করে লেখাপড়ার চর্চা করতেন। এঁরা বৈদিক মন্ত্রও রচনা করেছেন। এঁদের ব্রহ্মবাদিনী বলা হোত। বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতির নাম বেদে পাওয়া যায়। আর্যরা যুদ্ধে তীর-ধনুক, বর্শা, খড়্গ, কুঠার প্রভৃতি ব্যবহার করত। আর্য-বালকেরা গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া শিখত। লেখাপড়া শেখা শেষ হলে তারা সংসারধর্ম পালন করত। তারপরে যখন বেশ বয়স হোত, তখন বনে গিয়ে এরা তপস্যা করত। বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করত এবং সংসারের সব চিন্তা ত্যাগ করে শুধু মুক্তির চিন্তায় জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিত।

আর্যদের ধর্ম ঃ বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র ছিলেন বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা, বরুণ সাগরের দেবতা, মিত্র আলোকের দেবতা এবং অগ্নি তাপের দেবতা। ইন্দ্র ছিলেন দেবতাদের রাজা। দেবতাদের তৃপ্তির জন্যে আর্যরা যজ্ঞ করত।

বৈদিক যুগের রাজা ঃ বৈদিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল একটা বড়ো পরিবারের মতো। আর্যরা গ্রামে বাস করত। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠত একটি 'জন' এবং কয়েকটি 'জন' নিয়ে একটি 'রাজ্য'। রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিকে রাজা বলা হোত। রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন পুরোহিত। সমাজে পুরোহিতদের যথেষ্ট সম্মান ছিল।

'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুটি পরিষদ রাজাকে শাসনকার্যে পরামর্শ দিত। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা তাঁকে পদচ্যুত করতে পারত।

ভারতের দুই মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত ঃ বৈদিক যুগের শেষভাগে রামায়ণ ও মহাভারত নামে দু'খানি মহাকাব্য রচিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে সেই সময়ের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আছে।

অনেকে মনে করেন যে, রামায়ণ মহাভারতের আগে রচিত হয়েছিল।

মহাকাব্যের যুগে ছিল রাজার শাসন। রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল প্রজাপালন। রাজ্যে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী হলে রাজাকেই দায়ী করা হোত। ঐ সময়ে জন্মানুসারে জাতি নির্ণয় করা হোত। ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য ছিল সবচেয়ে বেশি। মানুষের

প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ খুব সম্মানের ছিল। এ যুগের রাজারা অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি নানা যাগযজ্ঞ করতেন। ছোটো-ছোটো রাজ্য থেকে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টাও এ যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। আর্য ও অনার্যরা বহুকাল পাশাপাশি বাস করে একে অপরের সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ঃ নানা আচার-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, পশুবলি আর জাতিভেদ সাধারণ মানুষকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। ঠিক এই সময়ে ভারতে দু'জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। একজন হলেন জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীর; অপরজন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধ।

প্রথমে তোমাদের মহাবীরের কথাই বলি।

মহাবীরঃ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উত্তর বিহারের কুন্দপুরে মহাবীরের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন এক রাজ-পরিবারের সন্তান। ছেলেবেলায় মহাবীরের নাম ছিল বর্ধমান। তাঁর পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিশলা। যশোদা নামে এক সুন্দরী বালিকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু সংসার তাঁর ভালো লাগে না। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ত্রিশ বছর। দীর্ঘ বারো বছর কঠোর সাধনা করে তিনি অবশেষে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় জিন বা বিজয়ী পুরুষ। তাঁর শিষ্যরা জৈন এবং তিনি মহাবীর নামে পরিচিতি। দক্ষিণ বিহারের পাবা নগরে ৭২ বছর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মহাবীর

মহাবীরের আগেও কয়েকজন জৈনগুরু বা তীর্থঙ্করের আবির্ভাব

হয়েছিল। তাঁরা অহিংসা-ধর্ম প্রচার করে গেছেন। এঁরা হিংসা করা, মিথ্যা বলা, চুরি করা বা দান গ্রহণ করা প্রভৃতি নিষেধ করে গেছেন। এই চারটি নীতি ছাড়াও মহাবীর সাধুজীবন যাপন করার কথা প্রচার করে গেছেন। জৈনরা জীবহত্যা করেন না ; কীট-পতঙ্গের প্রাণও তাঁদের কাছে পবিত্র। জৈনধর্ম ভারতের বাইরে প্রচারিত না হলেও, আজও তা ভারতের একটি প্রধান ধর্ম। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোকের পৌত্র সম্প্রতি এবং কলিঙ্গের রাজা খারবেল জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম ঃ বহুকাল আগে হিমালয়ের কোলে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলবস্তু নামে একটি ছোটো রাজ্য ছিল। সেখানে শাক্যবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। শাক্যদের নায়ক ছিলেন শুদ্ধোদন। এই শুদ্ধোদনের পুত্রই বুদ্ধদেব। ইনিই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম জীবনে বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ বা গৌতম। বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থ সব সময়েই যেন কি চিন্তা করতেন। শুদ্ধোদন ভাবলেন, বুঝি বিয়ে দিলে ছেলে সংসারী হবে। নিজে দেখে-শুনে পরমা সুন্দরী গোপার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিয়ে দিলেন। কিছুদিন বেশ সুখেই কাটল। ইতিমধ্যে সিদ্ধার্থের রাহুল নামে এক পুত্র-সন্তান হোল। কিন্তু সিদ্ধার্থ সেই আগেরই মতো কেবল চিন্তাই করে চলেছেন—কি হবে সংসারে থেকে! রোগ, শোক আর দুঃখ, এই নিয়ে জীবন! তিনি ভাবতে লাগলেন, কি করে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। সংসারে থাকলে দিন দিন তিনি মায়া-মমতার বাঁধনে জড়িয়ে পড়বেন, আর তাতে কেবল দুঃখই বাড়বে।

বুদ্ধদেব

তাই একদিন গভীর রাতে সংসার ছেড়ে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর বয়স, বড় জোর, উনত্রিশ বছর।

উরুবিল্ব নগরে ছয় বছর কঠিন সাধনার পর তাঁর দেহ ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল। তারপর একদিন তাঁর বাসনা পূর্ণ হোল। জররা-মৃত্যু-ব্যাধির দুঃখ থেকে তিনি যে-মুক্তিপথের সন্ধানে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সেই মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন। তখন তাঁর নাম হোল বুদ্ধ বা জ্ঞানী।

বুদ্ধদেব কেবল নিজের মুক্তিই চান নি, সকল মানুষের মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। তিনি কাশীর কাছে সারনাথের মৃগদাব বনে তাঁর উপদেশ প্রচার করলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্ত, মোগল্লান, আনন্দ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ এবং মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নানা জায়গায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করে আশি বছর বয়সে কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা বর্তমানে বিহারের অন্তর্গত রাজগৃহে (রাজগীর) মিলিত হন এবং তাঁর ধর্মমত গ্রন্থের আকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম 'ত্রিপিটক'। পরে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ঘটনা অবলম্বন করেও বই লেখা হয়। এর নাম 'জাতক'।

বুদ্ধদেবের ধর্মমত সহজ ও সুন্দর। মানুষের মন থেকে ভোগ-বাসনা দূর হলে, তবেই সে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। বৌদ্ধরা একে 'নির্বাণ' বলেছেন। 'নির্বাণ'-শব্দটির অর্থ সকল কামনা থেকে মুক্তি। সৎকর্ম, সত্য কথা, সৎ সঙ্কল্প, সৎ চেষ্টা এরকম আটটি উপায়ে নির্বাণ বা মুক্তিলাভ করা যায়। বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিই হোল অহিংসা।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন মহাবীর ও বুদ্ধ তাঁদের নতুন ধর্মের কথা মানুষকে শোনাচ্ছিলেন, তখন ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল বহু ছোটো ছোটো জনপদ বা রাজ্য। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে মগধ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন দক্ষিণ বিহারকে মগধ বলা হোত। এই মধের অধীনে যে-বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তার কথাই এখন বলছি।

রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য ঃ আলেকজাণ্ডার পারস্য এবং ভারতের যে-অঞ্চলগুলো জয় করেছিলেন, তা সেলুকাস নামে তাঁর এক সেনাপতির অধিকারে আসে। এসব কথা তোমাদের আগেই বলেছি। এখন শোন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে এক ভারতীয় বীরের কথা। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে এক মৈত্রী-চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে ভারতের পাঞ্জাব এবং বর্তমান আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের চারটি প্রদেশ (কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মকরাণ) চন্দ্রগুপ্তের অধিকারে আসে। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় সেলুকাস একজন গ্রীক দূতকে পাঠান। এই গ্রীক দূতের নাম মেগাস্থিনিস। তাঁর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে আমরা মৌর্য-শাসনকালে সমাজের সুন্দর বর্ণনা পাই। পরে তোমাদের এ বিষয়ে বলব।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ আলেজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন দক্ষিণ বিহারে নন্দরাজারা রাজত্ব করতেন। নন্দরাজাদের আমলেই মগধকে কেন্দ্র করে একটি মস্ত বড়ো সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। আলেকজাণ্ডারের সময়ে ধননন্দ নামে নন্দবংশের এক রাজা মগধে রাজত্ব করতেন। চন্দ্রগুপ্ত এই ধননন্দকে পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন।

আলেকজাণ্ডার যখন পাঞ্জাবে, তখন চন্দ্রগুপ্ত নামে এক তরুণ যুদ্ধবিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে তাঁর শিবিরে এসেছিলেন। কোনো কারণে আলেকজাণ্ডার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। তখন চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক শিবির থেকে পলায়ন করে নিজের প্রাণ বাঁচান। এই চন্দ্রগুপ্তই পরবর্তী কালে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্বন্ধে গ্রীকদের লিখিত বিবরণ এবং ভারতের কিছু কিংবদন্তী আছে। শোনা যায়, মগধের শেষ নন্দসম্রাটের মুরা নামে এক দাসী ছিল। সেই দাসীরই পুত্র চন্দ্রগুপ্ত। আবার কারো মতে চন্দ্রগুপ্ত মোরিয় নামে একটি ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের সময়ে মোরিয়রা পিপ্পলীবন নামে একটি রাজ্যে রাজত্ব করতেন। কৌটিল্য বা চাণক্য নামে তক্ষশিলার এক চতুর ব্রাহ্মণের সহায়তায় তিনি একটি সেনাদল গঠন করেন এবং এই সেনাদলের সাহায্যে মগধরাজ ধননন্দকে বিনাশ করে সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর

হিমালয় থেকে মহীশূর পর্যন্ত ভারতের এক বিরাট অঞ্চলে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভারতের ছোটো-বড়ো অনেক রাজ্যের মধ্যে মগধই ছিল শ্রেষ্ঠ। মৌর্য সম্রাটের একটি বিশাল সেনাবাহিনী ছিল। এ ছাড়া, তাঁর একটি নৌ-বাহিনীও ছিল। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত ছিল। রাজপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন প্রদেশে শাসন করতেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল একটি প্রকাণ্ড শহর। খুব উঁচু প্রাচীর দিয়ে শহরটি ঘেরা ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল কাঠের তৈরি, এর কারুকার্য ছিল খুব সুন্দর। পাটনার কাছে কুমারহার গ্রামে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের লেখা অর্থশাস্ত্রেও চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার রাজা হন। বিন্দুসারের পুত্র অশোক মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর মতো মহানুভব সম্রাট পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

অশোক ঃ প্রথম জীবনে অশোক নাকি নিষ্ঠুর ছিলেন। অভিষেকের আট বছর পরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। এখনকার উড়িষ্যার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। কলিঙ্গ যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ লোক নিহত হয়, এর চেয়েও বেশি লোক মারা যায় অনাহারে এবং মহা-মারীতে। এ ছাড়াও, দেড় লক্ষ লোক দেশান্তরিত হয়। যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণাম দেখে দুঃখ আর অনুতাপে অশোকের অন্তর ভরে ওঠে। এর পরে তিনি আর কোনো যুদ্ধ করেন নি। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিনি জীবের

অশোক

কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের যাতে উন্নতি হয়, সেজন্য অশোক পাহাড়ের গায়ে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ খোদাই করে দিয়েছিলেন। জনসাধারণের সুবিধার জন্যে উপদেশগুলো পালি ভাষায় এবং ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হয়েছিল।

অশোকের ব্রাহ্মী লিপি

এ ছাড়া, তিনি নানা স্থানে স্তম্ভের গায়ে বুদ্ধের বাণী খোদাই করে দিয়েছিলেন। ধর্মমহামাত্র নামে একদল দায়িত্বশীল কর্মচারী ধর্মপ্রচার করতেন। পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে তিনি সিংহলে ধর্মপ্রচার করতে পাঠান। সম্রাটের নির্দেশে প্রচারকেরা পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ধর্মপ্রচারের জন্যে পৃথিবীর আর কোনো রাজা এরকম চেষ্টা করেন নি। প্রজারা ছিল তাঁর সন্তানের মতো। তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্যেও অনেক কাজ করে গেছেন। তিনি রাজ্যের নানা স্থানে রাস্তাঘাট তৈরি করান। রাস্তার ধারে ধারে বৃক্ষ রোপণ এবং অতিথিশালা নির্মাণ করান। তিনি জল সরবরাহের জন্য পুকুর ও খাল কাটিয়েছিলেন, মানুষ ও পশুদের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন। অশোক ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের অন্যতম।

অশোকের কোনো উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। ফলে, তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মৌর্যবংশের শাসন ভারতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

অশোকের শাসনকালে মৌর্য সাম্রাজ্য পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদী

পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে এত বড়ো সাম্রাজ্য মৌর্যদের আগে বা পরে আর কখনও গড়ে ওঠে নি। উপযুক্ত কেন্দ্রীয় শাসনের ফলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। অশোকের পরে সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতি ঘটে। এই সময় বিদেশ থেকে এসে কয়েকটি জাতি ভারত আক্রমণ করে। ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক, পার্থিয়ান এবং সিথিয়ান বা শকেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করে।

ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক : সে যুগে আফগানিস্তানের কিছুটা অংশের নাম ছিল ব্যাক্‌ট্রিয়া। ব্যাক্‌ট্রিয়া থেকে গ্রীকরা এসে পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করে। ডেমেট্রিয়স ও মিনাণ্ডার নামে দুজন গ্রীক

রাজা ছিলেন খুব বিখ্যাত। মিনাণ্ডার বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে গ্রীক রাজারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করে দুর্বল হয়ে পড়ে। এক সময় গ্রীক রাজ্যগুলো ভেঙে যায়।

শক রাজগণঃ শকেরা প্রথমে থাকত মধ্য এশিয়ায়, পরে তারা কাবুল নদীর উপত্যকায় বাস করতে থাকে। ঐ জায়গাটি শকস্থান বা সিস্তান নামে পরিচিত হয়।

শকদের আক্রমণে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজ্যগুলো ধ্বংস হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারত ছাড়াও মথুরা, মালব এবং গুজরাটেও শকরা আধিপত্য বিস্তার করে। শক রাজাদের মধ্যে রুদ্রদামন ও নহপানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পার্থিয়ান বা পহ্লব রাজগণঃ পার্থিয়ানরা এসেছিল ইরান থেকে। এরাও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের রাজাদের মধ্যে গণ্ডোফারনেসের নাম বিখ্যাত। শোনা যায়, যীশুখ্রীস্টের শিষ্য সেণ্ট টমাস খ্রীস্টধর্ম প্রচার করার জন্যে গণ্ডোফারনেসের রাজসভায় এসেছিলেন।

কুষাণ রাজগণঃ এই যুগের বৈদেশিক আক্রমণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল কুষাণগণ। কুষাণরা ছিল মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর জাতি। ভারতের কুষাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কণিষ্ক। তাঁর রাজ্য আফগানিস্তান থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুরুষপুর বা পেশোয়ারে তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে কাশ্মীরে বৌদ্ধদের একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় মহাযান ধর্মমত প্রাধান্য পায়। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু চৈত্য, বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর রাজসভায় দার্শনিক নাগার্জুন, কবি অশ্বঘোষ এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র-রচয়িতা চরক প্রভৃতি সেকালের জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হয়েছিল। কুষাণদের আমলে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার কিছু কিছু প্রভাব ভারতে প্রবেশ করে। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে ভারতবর্ষে যে-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, কুষাণ রাজাদের সুশাসনে তা অনেকটা দূর হয়। কুষাণ রাজারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

মগধের গুপ্ত সাম্রাজ্যঃ কুষাণদের পরে উত্তর ভারতে গুপ্ত রাজাদের আমলে আবার একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

গুপ্ত রাজবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী রাজকুমারী কুমারদেবীকে বিবাহ করে নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্ত একজন দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভে তাঁর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে চম্বল পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁর সময়ের এক রকমের মুদ্রা দেখে মনে হয় যে, তিনি সুন্দর বীণা বাজাতে পারতেন।

সমুদ্রগুপ্ত

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার মতো বীর এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি মালব ও সৌরাষ্ট্র জয় করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। সৌরাষ্ট্রের শক রাজাদের বিতাড়িত করে তিনি শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। তিনি পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের খুব সমাদর করতেন। তাঁর রাজসভায় নাকি নবরত্ন অর্থাৎ নয় জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। নবরত্নের একজন ছিলেন মহাকবি কালিদাস।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়ান নামে এক চীনা পরিব্রাজক ভারতে আসেন। ফা-হিয়ান তিন বছর পাটলিপুত্রে বাস করেন। ফা-হিয়ানের বিবরণ থেকে আমরা সে যুগের অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারি। গুপ্ত রাজাদের আমলে সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নতি ঘটে। কালিদাস, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রমুখরা সুন্দর সুন্দর কাব্য ও নাটক রচনা করেন। গুপ্ত রাজারা ছিলেন হিন্দু। রামায়ণ-মহাভারত গুপ্ত যুগে নতুন করে লেখা হয়। মোট কথা, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে যুগে একটা নতুন জীবনের সাড়া জেগেছিল। সেজন্যে গুপ্ত যুগকে ভারতের সুবর্ণ যুগ বলা হয়। গুপ্ত রাজবংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫ থেকে ৪৬৭ খ্রীস্টাব্দ)। হুনদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়।

প্রাচীন বাংলা ঃ বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারাই বাঙ্গালী, আর বাঙ্গালীরা যে-দেশে বাস করে, তার নাম বঙ্গদেশ বা বাংলা। বাংলার উত্তরে হিমালয় ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ; পূর্বে গারো, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া উচ্চভূমি এবং ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্বতশ্রেণী আর পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল। যে বঙ্গদেশের সীমানার কথা বলা হলো, সে বঙ্গদেশ বা বাংলা ছিল অবিভক্ত, এখনকার মতো পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ—এ ভাবে দু'টুকরো হয়ে যায় নি।

বাংলা একটি সুপ্রাচীন দেশ। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, জৈন আর বৌদ্ধ সাহিত্যে বাংলার উল্লেখ আছে। তবে বর্তমান কালের বাংলা তখন নানা অঞ্চল বা জনপদে বিভক্ত ছিল। জনপদগুলোর ছিল নানা নাম। বঙ্গ, গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সমতট, হরিকেল, সুহ্ম, পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী, রাঢ়া বা রাঢ় দেশ। কোনো কোনো জনপদের রাজনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে তার আয়তন বেড়েছে বা কমেছে। আর আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নামেরও হয়েছে নানা হেরফের। মুসলমান যুগেই প্রথম বঙ্গদেশের জনপদগুলো একত্রে বাংলা অথবা বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়। পরে ইয়োরোপীয়রা একে বেঙ্গল (Bengal) নামটি দিয়েছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে প্রাচীন বাংলা ক্রমেই আর্যসভ্যতার সংস্পর্শে আসে। বাংলার রাজা বিজয়সিংহের সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা)-বিজয়ের কাহিনী পাই মহাবংশ নামে একটি সিংহলী গ্রন্থে। গঙ্গানদীর নিম্ন উপত্যকায় যে-অঞ্চল সমুদ্রের খুব কাছাকাছি, প্রাচীন কালে তাকেই বোধ হয় গঙ্গারাষ্ট্র বলা হোত। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমি গঙ্গারিডি (বা গঙ্গরিডই) নামে যে-একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন, তা বোধ হয় গঙ্গারাষ্ট্রই। বঙ্গদেশ তখন মগধের নন্দ রাজাদের অধীনে ছিল। গঙ্গারাষ্ট্র মৌর্যদেরও অধীন হয়। শিলালিপির প্রমাণ থেকে বলা চলে যে, উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। শুঙ্গ রাজাদের আমলে বঙ্গ পাটলিপুত্র রাজ্যের অধীনে ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। খ্রীষ্টীয় ১ম ও ২য় শতকেও গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাষ্ট্রের খ্যাতি এতটুকু ম্লান হয় নি। গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী গঙ্গা বা গঙ্গানগর তখনও বর্তমান। প্রাচীন বাংলায় কুষাণদের আধিপত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই, তবে খ্রীষ্টীয়

চতুর্থ শতক পর্যন্ত বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় পেরিপ্লাস ও টলেমির বিবরণে, মিলিন্দ-পঞ্‌হো ও জাতকের গল্পে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। গঙ্গানগরে সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র তৈরি হোত। এই সময়ে বাংলার সঙ্গে মিশর ও রোম সাম্রাজ্যের, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর এবং চীনের রীতিমতো ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বাংলার সমৃদ্ধির আকর্ষণেই নন্দ রাজাদের আমল থেকে গুপ্ত রাজাদের আমল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে বাংলায় আধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা চলেছে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে গুপ্ত রাজাদের আমল থেকে। মেহেরৌলি লৌহস্তম্ভে রাজা চন্দ্রের বঙ্গবিজয়ের কথা আছে। এই চন্দ্র কারো মতে গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, কারো মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। রাজা চন্দ্র যিনিই হোন না কেন, তাঁর বঙ্গবিজয়ের পূর্বে বঙ্গদেশ যে কিছুকাল স্বাধীন ছিল, এ কথা বলা চলে।

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি লিপিতে সিংহবর্মার পুত্র পুষ্করণের রাজা চন্দ্রবর্মার কথা আছে। ইনিই বোধ হয় সে সময়ে রাঢ় অঞ্চল শাসন করতেন। সমুদ্রগুপ্ত রাজা চন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করেছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত সমতট ছাড়া প্রাচীন বাংলার আর প্রায় সব জনপদই গুপ্ত সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের আমল থেকে প্রায় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত বাংলার গুপ্ত-রাজত্বের প্রধান কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। ৫০৭-৮ খ্রীস্টাব্দের আগে কোনো এক সময়ে সমতটও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। গুপ্তরাজাদের আমলে বাংলার সাধারণ মানুষ জমিজমা ক্রয়-বিক্রয়ে, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহার করত। স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল দিনার এবং রৌপ্যমুদ্রার নাম রূপক। গুপ্তরাজাদের আমলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার হয়।

ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ: সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসীরা পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগযোগ রক্ষা করে চলত। ভারতীয়দের এই বিদেশযাত্রার প্রধান প্রেরণা ছিল বাণিজ্য। আলেক-জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকেই পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হতে থাকে। ইন্দো-গ্রীক, শক ও পার্থিয়ানরা আক্রমণকারী হিসেবে এলেও পরে ভারতীয় সমাজে মিশে যায়।

কুষাণ যুগে সুদূর রোমের সঙ্গে ভারতের নিয়মিত বাণিজ্য চলত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের লেখা 'পেরিপ্লাস' নামে একটি গ্রন্থে এই বাণিজ্যিক লেনদেনের সুন্দর বর্ণনা আছে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে তখন অনেক বন্দর ছিল। ঐসব বন্দর দিয়ে নানারকম বিলাসদ্রব্য, মূল্যবান্ পাথর, হাতির দাঁত, সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় প্রভৃতি রোমে যেত, আর রোম থেকে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আসত। স্থলপথেও এই বাণিজ্য চলত।

ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যোগাযোগ ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই। প্রায় সমগ্র মধ্য এশিয়া ছিল কনিষ্কের অধীন। মধ্য এশিয়ার একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তুর্কিস্তানের বালির স্তূপের নিচে বহু বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপ, বৌদ্ধ মূর্তি, হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি, মুদ্রা এবং ভারতীয় ভাষায় লেখা অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে। এসব থেকে বোঝা যায় যে, এক সময়ে ধর্মে, ভাষায় এবং শিল্পরীতিতে মধ্য এশিয়ার অধিবাসীরা ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়।

মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম একে একে চীন, কোরিয়া, জাপান এবং তিব্বতে পৌঁছায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও ভারতীয় সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ করে। এখনকার ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাঞ্চল, মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোকে প্রাচীন কালে সুবর্ণভূমি বলা হোত। ভারতের পূর্ব উপকূলের দন্তপুর, তাম্রলিপ্ত (এখনকার তমলুক) প্রভৃতি বন্দর থেকে ভারতীয় বাণিজ্য-জাহাজ সুবর্ণভূমিতে যেত। অশোকের রাজত্বকাল থেকেই সিংহলের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ঘটেছিল।

বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সভ্যতার ওপরেও ঐ সকল দেশের সভ্যতার নানা রকম প্রভাব পড়েছিল। এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে। পশ্চিম ভারত অতি প্রাচীন কাল থেকেই পারস্য ও গ্রীসের সংস্পর্শে এসেছিল। পারসিক, গ্রীক ও ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ের ফলে এই অঞ্চলে একটি নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। একে গান্ধার-শিল্প বলা হয়। গ্রীক-দেবতাদের অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি-নির্মাণের মধ্যে গান্ধার-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির সংমিশ্রণের ফলে ঐ সব দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির

সমন্বয় ঘটে। এই সমন্বয়ের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি যথেষ্ট লাভবান্ হয়। ফলে ভারতীয় মনীষার বিকাশ ঘটে।

সামাজিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীরা ক্রমশঃ ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে ভারতের সমাজদেহে মিশে যায়। ফলে আর্যদের চতুর্বর্ণের জায়গায় অসংখ্য উপবিভাগের সৃষ্টি হয়। জাতিভেদ-প্রথার মধ্যেও যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা যায়।

মেগাস্থিনিস ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় যে-গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস এসেছিলেন, একথা তোমাদের বলেছি। মেগাস্থিনিস কাবুল ও পাঞ্জাব হয়ে পাটলিপুত্রে আসেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র ও রাজপ্রাসাদ এবং মৌর্য শাসন-প্রণালী-সম্পর্কে তাঁর বিবরণ খুবই মূল্যবান্।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঃ রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল প্রকাণ্ড শহর। মৌর্য সম্রাটের বিশাল সেনাবাহিনীতে ছিল ৬ লক্ষ পদাতিক, ৩০,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৯,০০০ হাতি। এ ছাড়া, ছিল একটি নৌ-বাহিনী।

রাজ্যশাসনের জন্যে অনেক কর্মচারী ছিল। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারী। রাজপ্রতিনিধিরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ শাসন করতেন।

দেশে চুরি-ডাকাতি ছিল না। দণ্ডবিধি খুব কঠোর ছিল। সম্রাট বহু গুপ্তচর নিয়োগ করেছিলেন; তারা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াত। ভারতবাসীদের সাধু ও সরল ব্যবহারে মেগাস্থিনিস মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারা মামলামোকদ্দমা করতে চাইত না, পরের দ্রব্যেও লোভ করত না। ভারতবাসীরা সত্য কথা বলত। তারা ক্রীতদাস রাখত না। এ কথাটি অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয়রা ছিল স্বাধীনতাপ্রিয়। মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা—(১) দার্শনিক, (২) কৃষক, (৩) শিকারী ও পশুপালক, (৪) বণিক ও শ্রমশিল্পী, (৫) সৈনিক, (৬) পর্যবেক্ষক বা গুপ্তচর এবং (৭) অমাত্য।

মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতীয়রা একমাত্র যজ্ঞের সময়ে মদ্য পান করত। তবে তারা বিলাসী ছিল এবং অলঙ্কার পছন্দ করত। ভারতবাসীর প্রধান উপজীবিকা ছিল কৃষি। কৃষকরা ছিল পরিশ্রমী, সংযমী ও মিতব্যয়ী।

ফা-হিয়ান ঃ চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয়

চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে সেই সময়কার ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। তখন রাজ্যের অবস্থা খুব ভালো ছিল। খাজনা ছিল কম, জিনিসপত্র ছিল সস্তা। সুতরাং প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। মৌর্যযুগের মত শাস্তি অত কঠোর ছিল না। সাধারণ অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। একমাত্র বিদ্রোহ ও দস্যুতার জন্যে অঙ্গচ্ছেদ করা হোত। সকলে নির্ভয়ে পথে চলাফেরা করতে পারত। দেশের মধ্যে যোগাযোগের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। প্রজাদের মঙ্গলের জন্যে রাজা দানশালা ও ধর্মশালা তৈরি করে দিয়েছিলেন। রুগ্ণ ও দুঃস্থের জন্যে হাসপাতাল ছিল। রাজা অন্য ধর্মের প্রতি খুব উদার ছিলেন। দেশের নানা স্থানে বহু দেব-মন্দির ও বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হয়েছিল।

মথুরা ও মগধের ঐশ্বর্য দেখে ফা-হিয়ান মুগ্ধ হয়েছিলেন। পাটলিপুত্রে মৌর্যদের রাজপ্রাসাদের শোভা-সৌন্দর্য মেগাস্থিনিসের বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। বাংলায় তাম্রলিপ্ত ছিল সেকালের একটি বিখ্যাত বন্দর। তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকরা জাহাজে চড়ে দূর-দূরান্তরে বাণিজ্য করতে যেত। চণ্ডাল ও নীচ জাতির লোকেরা নগরের বাইরে বাস করত। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়ানের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, গুপ্তযুগে সাধারণ মানুষের জীবনে সুখ-সচ্ছলতা ও নিরাপত্তাবোধ বেড়েছিল। রাষ্ট্রেরও সমৃদ্ধি বেড়েছিল। ফলে সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম প্রভৃতি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

এবার তোমাদের এই বিষয়ে কিছু বলব।

সাহিত্য : সাহিত্যের দিক দিয়ে মৌর্যদের পরবর্তী কালে ভারতীয় মনীষার অপূর্ব বিকাশ হয়েছিল। অশ্বঘোষ, বসুমিত্র প্রভৃতির রচনা এ কালের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। রামায়ণ, মহাভারত, বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', যাজ্ঞবল্ক্যের 'স্মৃতি', মনুর 'সংহিতা' প্রভৃতিও এ সময়ে সঙ্কলিত হয়। গুপ্তযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। কালিদাসের লেখা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক এবং 'রঘুবংশম্', 'কুমারসম্ভবম্' প্রভৃতি কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।

শিল্প : গান্ধারের শিল্পীরা অ্যাপোলো, জিউস, ডায়না প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান দেবদেবীর অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতে থাকেন। আবার সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় মেলে অমরাবতী ও মথুরার শিল্পরীতিতে। পেশোয়ারে সম্রাট কনিষ্কের তৈরি চৈত্য, সাঁচি স্তূপের তোরণদ্বারের কারুকার্য, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি জায়গার গুহাচৈত্য ; বরহুত, ভাজা ও বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি মৌর্যোত্তর যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন। গুপ্তযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। এ যুগের পাথর ও ব্রঞ্জের তৈরি বহু দেবদেবীর মূর্তি আজও আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। হায়দ্রাবাদের অজন্তা গুহার প্রাচীর-চিত্রাবলী অপূর্ব শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন। ছবি-গুলোর বেশির ভাগই বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে। নারীমূর্তির এমন সুন্দর ছবি আর কোথাও দেখা যায় না।

অজন্তার গুহাচিত্র

বিজ্ঞান : পাটলিপুত্রের জীবক ছিলেন বৈদ্যকশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তক্ষশিলায় আচার্য আত্রেয়ের কাছে তিনি বৈদ্যকশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি শল্যশাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। গুপ্ত আমলের হিন্দুরা শারীর-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষে রসায়ন-শাস্ত্রেরও বিশেষ উন্নতি হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে ভারতে পারদ ও লোহার রাসায়নিক গবেষণা হয়েছিল।

আকরিক ধাতুকে বিশুদ্ধ করে নেবার বিদ্যাও প্রাচীন ভারতীয়রা আয়ত্ত করেছিলেন।

আর্যভট্টের সময়ে ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘোরে। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ তিনিই আবিষ্কার করেন। তিনি ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বরাহমিহিরের জন্ম হয় ৫০৫ খ্রীস্টাব্দে। বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' নামক গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি মূল্যবান্ বিবরণ রেখে গেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন আর একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

বৈদিক যুগে আর্যরা সংখ্যাগণিতে খুব উন্নতিলাভ করেছিলেন। দশমিক পদ্ধতিতে অঙ্ক-লিখন হিন্দুদেরই সৃষ্টি। বীজগণিতের মোট তত্ত্বগুলিও আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত জানতেন।

প্রাচীন ভারতে ধাতু-বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। দিল্লীতে যে-মসৃণ লোহার থামটিতে আজও মরিচা ধরে নি, তা তৈরি হয়েছিল আজ থেকে পনেরো শো বছর আগে।

শিক্ষা ঃ শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা পিছিয়ে থাকে নি। প্রাচীনকাল থেকেই পশ্চিম পাঞ্জাবের তক্ষশিলা শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। ভারতের নানা জায়গা থেকে এবং চীন, গ্রীস, মিশর, ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকেও বহু ছাত্র এখানে জ্ঞানলাভের জন্য আসত। পঞ্চম শতাব্দীতে মগধের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার স্থান অধিকার করে। এখানে ব্যাকরণ, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, অঙ্ক, অর্থনীতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র পড়ান হোত। দেশ-বিদেশ থেকে বহু ছাত্র এখানে এসে পড়াশুনা করত।

অনুশীলনী

১। বেদ কাকে বলে? বেদ কথাটির অর্থ কী? বেদ কয়খানা এবং কী কী?

২। বৈদিক যুগের সমাজ কেমন ছিল?

৩। আর্যদের ধর্মের কথা সংক্ষেপে বল।

৪। বৈদিক যুগে রাজা কাকে বলা হোত? রাজা কাদের পরামর্শ নিয়ে শাসন করতেন?

৫। ভারতের দু'খানি মহাকাব্যের নাম কী কী? মহাকাব্য দু'খানি থেকে আমরা কী কী জানতে পারি?

৬। মহাবীরের জীবন সম্বন্ধে যা জান বল।

৭। জৈন ধর্মের কয়েকটি নীতির কথা বল।

৮। বুদ্ধদেবের জীবনকথা নিয়ে একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখ।

৯। বুদ্ধদেবের ধর্মমত সম্বন্ধে কী জান?

১০। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাহিনী সংক্ষেপে বল।

১১। ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?

১২। কুষাণ রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন? তাঁর কথা সংক্ষেপে বল।

১৩। সমুদ্রগুপ্ত কে? তাঁর সম্বন্ধে কী জান?

১৪। প্রাচীন বাংলার কথা যা জান, সংক্ষেপে বল।

১৫। 'ভারতের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগ'—এই বিষয় নিয়ে একটি ছোটো প্রবন্ধ লেখ।

১৬। মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের সম্বন্ধে যেসব কথা বলে গেছেন, তা সংক্ষেপে লেখ।

১৭। ফা-হিয়ান কে? তিনি কতদিন ভারতে ছিলেন? তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে কী কী বলে গেছেন?

১৮। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়দের কৃতিত্বের কথা বল।

১৯। প্রাচীন ভারতের শিল্পকীর্তির কথা বল।

২০। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয়রা কী রকম উন্নতি করেছিলেন?

২১। 'শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা পিছিয়ে থাকে নি'—কথাটি বুঝিয়ে দাও।

২২। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) ঋগ্বেদ — লেখা। (গ) আর্যরা যজ্ঞের সময়ে — পান করত। (গ) রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন —। (ঘ) চন্দ্রগুপ্ত — পরাজিত করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। (ঙ) নবরত্নের একজন ছিলেন মহাকবি—। (চ) প্রায় সমগ্র মধ্য এশিয়া ছিল — অধীন। (ছ) – ও – ঐশ্বর্য দেখে ফা-হিয়ান মুগ্ধ হয়েছিলেন।

২৩। নিচের বিষয়গুলো সম্বন্ধে যা জান বল:

গ্রামণী, সভা, ইন্দ্র, ত্রিশলা, নির্বাণ, প্রসেনজিৎ, কৌটিল্য, নহপান, কুমারদেবী. শকারি, আর্যভট্ট।

———